হুমায়ূন আহমেদ

আজ আমি কোথাও যাব না

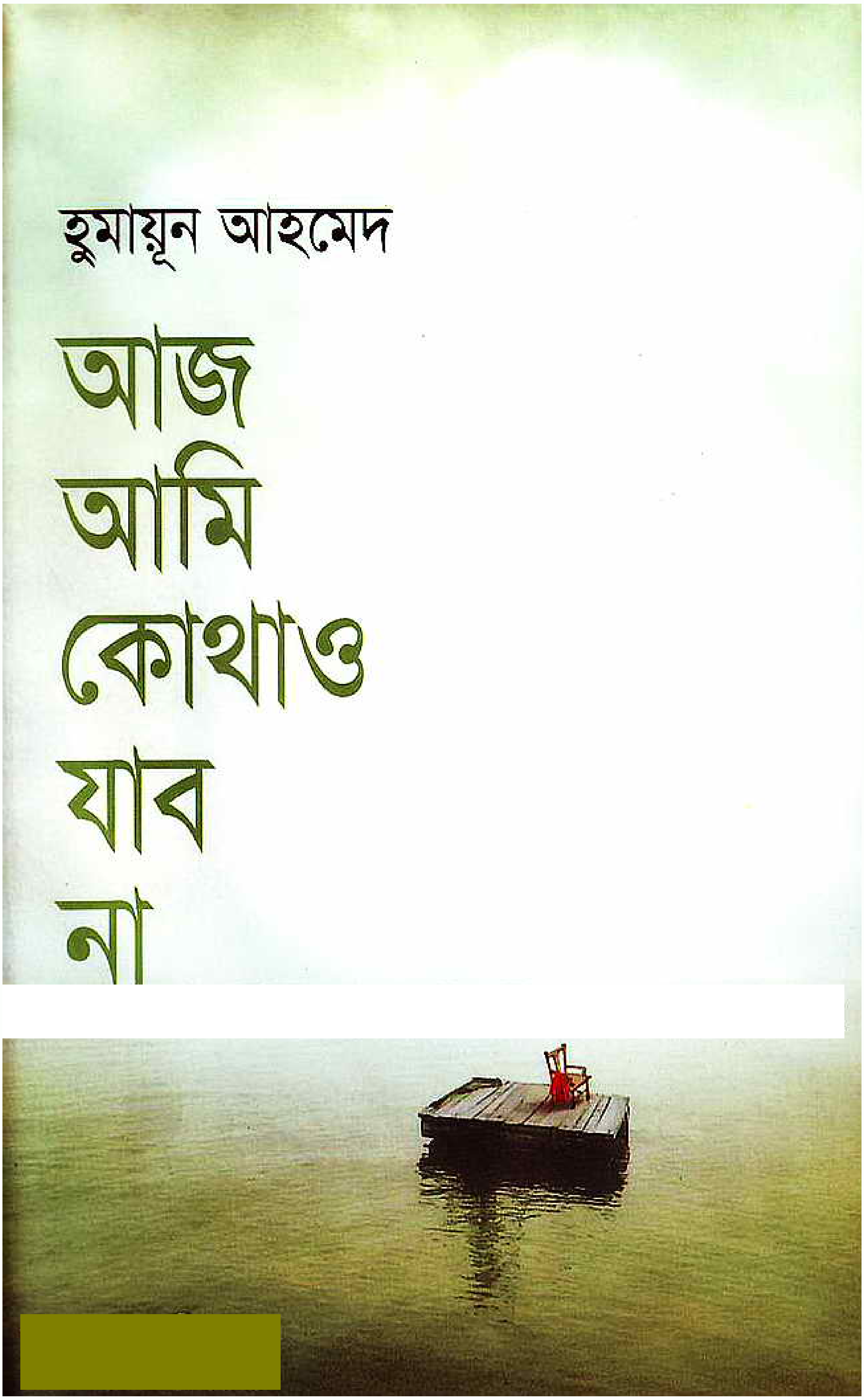
হুমায়ূন আহমেদ
আজ আমি কোথাও যাব না

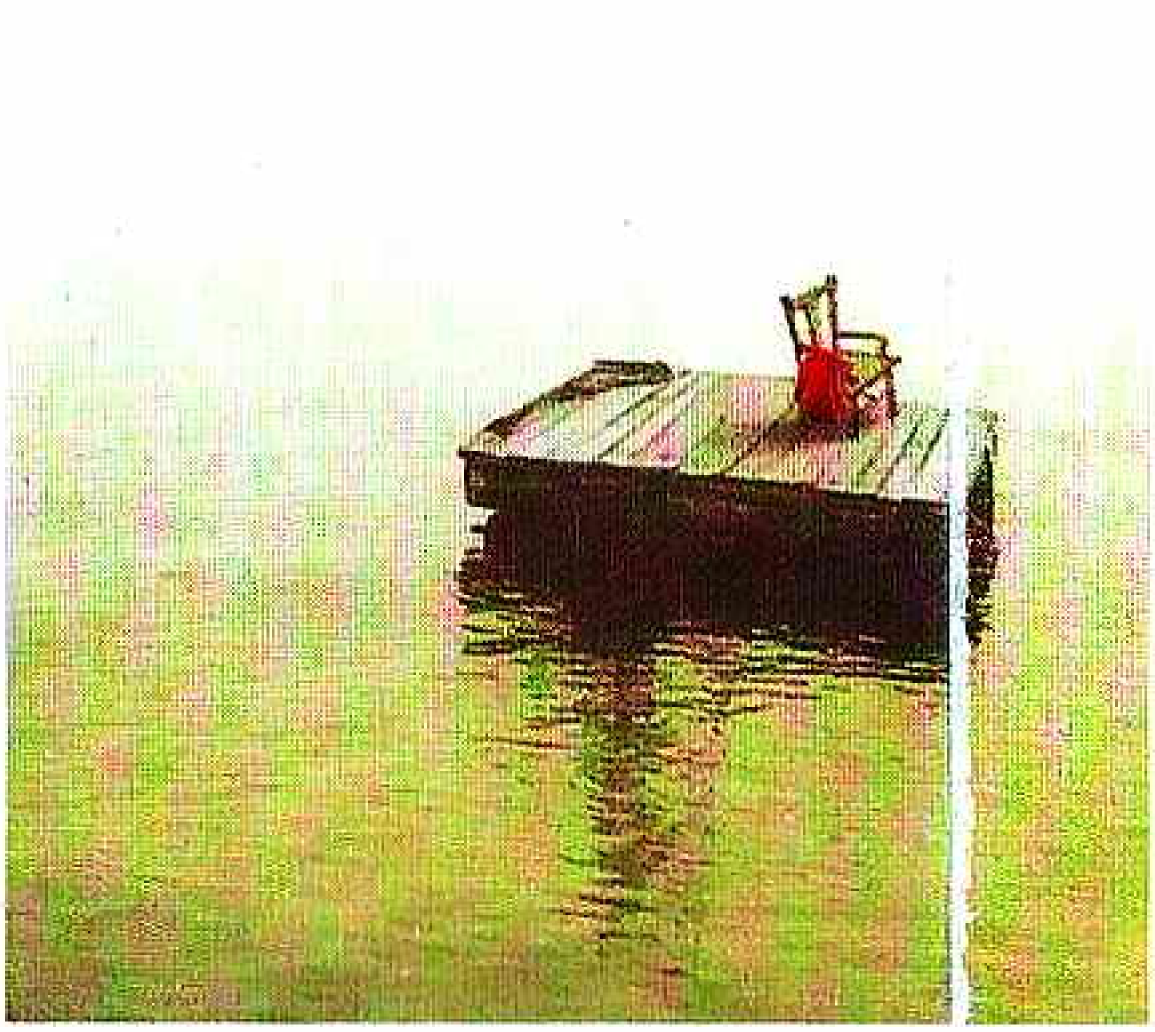

জয়নাল দু'বার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে—দু'বারই ধরা খেয়েছে। নকলের খুব সুবিধা ছিল। শিক্ষকরাও নকল সাপ্লাই-এ সাহায্য করেছেন, তাতেও লাভ হয় নি। এই জয়নাল ছোট মানুষ হয়েও অনেক বড় স্বপ্ন দেখে।

শামসুদ্দিন সাহেব নান্দাইল হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির শিক্ষক। সারা জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেন নি। কোনো মন্দ কথা বলেন নি। তিনি অনেক বড় মানুষ হয়েও ছোট স্বপ্ন দেখেন।

স্বপ্ন দেখে রাহেলা ও ইতি। একেক জনের স্বপ্ন একেক রকম।

'আজ আমি কোথাও যাব না' কিছু মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প।

মানুষ পৃথিবীতে এসেছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে। শোনা যায় কিছু মহাসৌভাগ্যবান মানুষ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়েও আসেন। আমার কপাল মন্দ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দূরের কথা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয় কাজ করে না। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আমি কোনো কিছুর গন্ধ পাই না। ফুলের ঘ্রাণ, লেবুর ঘ্রাণ, ভেজা মাটির ঘ্রাণ... কোনো কিছুই না।

এদেশের এবং বিদেশের অনেক ডাক্তার দেখালাম। সবাই বললেন, যে নার্ভ গন্ধের সিগন্যাল মস্তিষ্কে নিয়ে যায় সেই নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে। সেটা আর ঠিক হবে না। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গন্ধবিহীন জগৎ স্বীকার করে নিলাম।

কী আশ্চর্য কথা, অল্পবয়স্ক এক ডাক্তার আমার জগতকে সৌরভময় করতে এগিয়ে এলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর পর হঠাৎ লেবু ফুলের গন্ধ পেয়ে অভিভূত হয়ে বললাম, এ-কী!

যিনি আমার জগৎ সৌরভময় করেছেন, তাঁর নিজস্ব ভুবনে শত বর্ণের শত গন্ধের, শত পুষ্প আজীবন ফুটে থাকুক— এই আমার তাঁর প্রতি শুভ কামনা।

ডা. জাহিদ

নাকের ভেতর শিরশির করছে।

লক্ষণ ভালো না। তিনি চিন্তিত বোধ করছেন। হাঁচি উঠার পূর্বলক্ষণ। হাঁচি শুরু হয়ে গেলে সর্বনাশ। এই বিষয়ে তাঁর সমস্যা আছে। তাঁর হাঁচি একটা দু'টায় থামে না— চলতেই থাকে। তাঁর সর্বোচ্চ রেকর্ড আটচল্লিশ। তিনি ভৈরব থেকে ট্রেনে করে গৌরীপুর যাচ্ছিলেন। আঠারোবাড়ি স্টেশন থেকে হাঁচতে শুরু করলেন, পরের স্টেশন নান্দাইল রোডে এসে থামলেন। তখন নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করেছে। সাদা পাঞ্জাবি রক্তে মাখামাখি।

তিনি এখন যে জায়গায় বসে আছেন সে জায়গাটা হাঁচির বিশ্ব রেকর্ড করার জন্যে উপযুক্ত না। তিনি বসে আছেন দুর্গ টাইপ একটা বারান্দায়। বারান্দায় চৌদ্দটা কাঠের বেঞ্চ। বেঞ্চগুলিতে গাদাগাদি করে মানুষজন বসে আছে। এতগুলি মানুষের জন্যে এক কোনায় দু'টা মাত্র ফ্যান। বারান্দার এক দিকে চারটা বন্ধ জানালা। সেই জানালাগুলিও ভারি লোহার শিক দিয়ে আটকানো। অন্যদিকে খুপড়ি খুপড়ি ঘর। ঘরগুলির দরজা খুললে দেখা যায় ঘরের ভেতর আরেকটা ঘর, কাচের দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। কাচের দেয়ালের ওপাশে গম্ভীর মুখে আমেরিকান সাহেবরা বসে আছেন। ঘরগুলির নাম্বার আছে। একেক নাম্বারের ঘরে একেক জনের ডাক পড়ছে। ঘরে ঢোকা মাত্র দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে কী কথাবার্তা হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। মোটামুটি ভয়াবহ অবস্থা। এই অবস্থায় তিনি তাঁর বিখ্যাত ধারাবাহিক হাঁচি দিয়ে সাদা পাঞ্জাবি রক্ত মাখিয়ে লাল করে ফেলতে পারেন না। আজ অবশ্যি তাঁর গায়ে সাদা পাঞ্জাবি নেই। হালকা সবুজ রঙের ফুল শার্ট পরে এসেছেন।

তাঁর সিরিয়েল তের। এখন সাত নাম্বার যাচ্ছে। ছোটঘরে ঢোকার সময় এসে গেছে। তিনি প্রায় নিশ্চিত— আমেরিকান সাহেবের মুখোমুখি হওয়া মাত্র তাঁর হাঁচি শুরু হবে। সাহেব প্রথম কিছুক্ষণ মজা পাবে, তারপর বিরক্ত হবে। কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুরু করবে। তিনি হাঁচির যন্ত্রণায় কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারবেন না। তাঁর ইংরেজিও এলোমেলো হয়ে যাবে। তিনি নিজে ইংরেজির

শিক্ষক। ভুল-ভাল ইংরেজি বলা তাঁর জন্যে লজ্জার ব্যাপার হবে। সাহেব জেনারেল নলেজের কোনো প্রশ্ন করবে কি-না কে জানে? আমেরিকার ইতিহাস বিষয়ে দু'একটা প্রশ্ন করলে করতেও পারে। সে বিষয়ে মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। আমেরিকার সব প্রেসিডেন্টের নাম, তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁর জানা আছে। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে যে গুলি করে মেরেছিল তার নাম উইলিয়াম বুথ। সেই সময় আব্রাহাম লিংকন থিয়েটার দেখছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা উপন্যাস— নাম 'আংকেল টমস কেবিন'। উপন্যাসটা তাঁর পড়া। তবে মূল ইংরেজিতে পড়েন নি। অনুবাদ পড়েছেন। বাংলা অনুবাদের নাম 'টমকাকার কুটির'। নামটা সুন্দর হয়েছে। ইংরেজি নামের চেয়েও ভালো হয়েছে।

প্রথমে কি নাম জিজ্ঞেস করবে? ওদের তো আবার নামেরও অনেক ঝামেলা আছে। ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, মিডল নেম। তাঁর নাম শামসুদ্দিন আহমেদ। শামসুদ্দিন ফার্স্ট নেম। আহমেদ লাস্ট। মিডল নেম বলে কিছু নেই। মিডল নেম জিজ্ঞেস করলে কি ডাক নাম বলবেন? তাঁর ডাক নামটা খুব অদ্ভুত। তবে সাহেবদের চোখে অদ্ভুত কিছু ধরা পড়বে না। ওদের কাছে শামসুদ্দিনও অদ্ভুত, আবার আহমেদও অদ্ভুত।

চাচা মিয়া, আপনার সিরিয়েল কত?

শামসুদ্দিন চমকে উঠে দেখলেন তাঁর সামনে অতিরিক্ত রোগা, অতিরিক্ত লম্বা, প্রায় বক পাখি টাইপ একটা ছেলে— অতিরিক্ত লম্বার কারণেই কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ই সিরিয়েল জিজ্ঞেস করছে চাপা গলায় যেন খুবই গোপন কোনো খবর জানতে চাচ্ছে। তিনি আগ্রহ নিয়ে ছেলেটার দিকে তাকালেন। বয়স অল্প, বাইশ তেইশের বেশি হবে না। চোখে চশমা। চশমার ফ্রেম অনেক বড় বলে মুখটা ছোট লাগছে। অল্প বয়সেই বেচারার মাথায় টাক পড়ে গেছে। মাথার এক দিকের চুল লম্বা করে টাকের উপর দিয়ে টাক ঢাকার একটা চেষ্টা সে চালিয়েছে; তাতে লাভ হয় নি।

ছেলেটা আগের মতোই ফিসফিসে গলায় বলল, বসি আপনার পাশে? সীটটা খালি আছে না?

শামসুদ্দিন বললেন, খালি আছে। বসো।

আগে যেখানে বসেছিলাম সেখানে মাথার উপরে ফ্যান নাই। অন্যসময় গরমে আমার সমস্যা হয় না। কিন্তু টেনশানের সময় গরম সহ্য করতে পারি না। প্যালপিটিশন হয়।

শামসুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, টেনশন হচ্ছে?

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকাল। মনে হয় অনেক দিন সে এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন কারো কাছ থেকে শুনে নি। বোকামি ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়াও অর্থহীন— এ রকম ভঙ্গি করে সে বলল, আপনার সিরিয়েল কত ?

তের।

ছেলেটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি খুবই লাকি মানুষ।

কেন ?

লাকি নাম্বার পেয়েছেন। অনেকে বলে থার্টিন আনলাকি। আসলে লাকি। কিরোর নিউমারলজি বই-এ আমি নিজে পড়েছি। আপনার সিরিয়েল থার্টিন। তিন আর এক যোগ করলে কত হচ্ছে— চার না ?

হ্যাঁ চার।

আজকের তারিখটা খেয়াল করেন। বাইশ তারিখ। দুই-এ আর দুই-এ কত হচ্ছে— চার না ? সহজ হিসাব। আপনি ইনশাল্লাহ ভিসা পেয়ে যাবেন।

তিনি ভালোমতো ছেলেটাকে লক্ষ করলেন। কপাল কুঁচকে বসে আছে। হাতে নানান ফাইলপত্র। স্থির হয়ে সে যে বসে আছে তাও না। ক্রমাগত নড়াচড়া করছে। তিনি ছেলেটাকে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সিরিয়েল নাম্বার কত ?

আমার ফর্টি ওয়ান।

ফর্টি ওয়ান কি লাকি ?

আমার জন্যে খুবই আনলাকি। তবে আমেরিকানদের কথা কিছুই বলা যায় না। যাদের ভিসা পাওয়ারই কথা না তাদের পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিসা দিয়ে দিচ্ছে। জেনুইনদের রিফিউজ করে দিচ্ছে। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি পেয়ে যাবেন।

লাকি নাম্বার, এই জন্যে পাব ?

তা না— বুড়োদের এরা ভিসা দিয়ে দেয়। আপনার মুখে দাড়ি নেই, এটা একটা এডভানটেজ। যাদের মুখে চাপদাড়ি এদের ভিসা দেয় না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, এরা লম্বা দাড়ি দেখলেই ভাবে খোমেনীর লোক।

খোমেনীর লোক মানে ?

ইরানের খোমেনীর নাম শোনেন নাই ? আপনি তো দেখি গুহামানব। যা হোক বাদ দেন। আপনার নাকে সর্দি। নাক ঝেড়ে আসেন। নাকে সর্দি নিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নট করে দেবে। পিছনে চলে যান— দেখবেন একটা দরজার গায়ে লেখা 'রেস্ট রুম'। এরা পায়খানাকে বলে 'রেস্ট রুম'।

তুমি কি আগেও এখানে এসেছ ?

এটা আমার থার্ড টাইম। এবার না হলে আর হবে না। তবে এবার ইনশাল্লাহ আমার হবে। আজমীরে গিয়েছিলাম, খাজা বাবার দোয়া নিয়ে এসেছি। খাজা বাবার দোয়া নিয়ে যারা ভিসার জন্যে এসেছে সবারই ভিসা হয়েছে। এক হিন্দু ফ্যামিলিকে আমি চিনি। খাজা বাবার দোয়া নিয়ে এসে গুষ্ঠিসুদ্ধ ভিসা পেয়েছে। ইনক্লুডিং তাদের বাড়ির কাজের বুয়া।

শামসুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। খুপড়ি ঘর থেকে সুন্দরমতো একটা মেয়ে বের হয়েছে। তিন চার বছরের একটা ফুটফুটে ছেলে তার হাত ধরে আছে। মেয়েটির চোখে পানি। সে শাড়ির আঁচলে যতই চোখ মুছছে ততই পানি বেশি বের হচ্ছে। আর ছেলেটা খুবই অবাক হয়ে মা'র কান্না দেখছে। শামসুদ্দিন সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল। বুঝাই যাচ্ছে বেচারির মেয়েটির ভিসা হয় নি। হয়তো স্বামী পড়ে আছে আমেরিকায়, সে যেতে পারছে না। ছেলেটি হয়তো তার বাবাকে দেখে নি।

তিনি রেস্ট রুম খুঁজে পাচ্ছেন না। সারি সারি বেশ কিছু ঘর। কোনোটাতেই রেস্টরুম লেখা নেই। বড় দরজার পাশে কালো পোশাক পরা মিলিটারীদের মতো দেখতে একটা লোক বসে আছে। সে তাঁর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। রেস্টরুম কোন দিকে— এই লোককে জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হবে ? জিজ্ঞেস করতে হবে ইংরেজিতে। 'দয়া করে বলবেন বাথরুম কোন দিকে ?'— এর ইংরেজি কী হবে ? Kindly show me the way to the bathroom। ইংরেজি কি ঠিক আছে ? বাথরুমের আগে কি The আর্টিকেলটা বসবে ?

জিজ্ঞাসা করার আগেই বকের মতো দেখতে ছেলেটা ছুটে এলো। তাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে হড়বড় করে বলল, চাচা মিয়া যান, তাড়াতাড়ি যান। ডাক পড়েছে। 'ইয়া মুকাদ্দেমু' বলে ঘরে ঢুকবেন। কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দেবার আগে মনে মনে বলবেন 'ইয়া মুকাদ্দেমু'।

নাক ঝাড়া হলো না তো।

রুমাল নাই ? না থাকলে পাঞ্জাবির কোনায় মুছে ফেলেন।

তোমার নাম কী ?

আমার নাম দিয়ে এখন দরকার নাই। আগে ইন্টারভ্যু সেরে আসেন। 'ইয়া মুকাদ্দেমু ইয়া মুকাদ্দেমু' বলতে বলতে যান। 'ইয়া মুকাদ্দেমু' আল্লাহর একটা পাক নাম। এর অর্থ 'হে অগ্রসরকারী'। যে-কোনো ইন্টারভ্যুতে এই নাম কাজে আসে।

তাঁর ডাক পড়েছে চার নাম্বার ঘরে। গম্ভীর মুখে আমেরিকান এক সাহেব জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান সাহেব বলল— হ্যালো। সহজভাবে ভদ্র ভঙ্গিতে বলল।

শামসুদ্দিন থতমত খেয়ে গেলেন। সাধারণত টেলিফোনেই হ্যালো বলা হয়। মুখোমুখি কারো সঙ্গে দেখা হলেও কি হ্যালো বলা হয়? এর উত্তরে কি তাঁকেও হ্যালো বলতে হবে? নাকি তিনি বলবেন 'গুড মর্নিং'? বারটা বেজে থাকলে তো 'গুড মর্নিং' বলা যাবে না। বলতে হবে 'গুড আফটারনুন'।

তিনি কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। পর পর চারবার হাঁচি দিলেন। সাহেবটা বলল, ব্লেস ইউ। শামসুদ্দিন আরো হকচকিয়ে গেলেন। তাঁকে পুরোপুরি বিস্মিত করে দিয়ে আমেরিকান সাহেব সুন্দর বাংলায় বলল— আপনার ফার্স্ট নাম শামসুদ্দিন? পারিবারিক নাম আহমেদ?

তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমেরিকা যেতে চান কেন?

বেড়াতে যাব স্যার।

কথাটা মিথ্যা বলা হলো। তিনি দরিদ্র মানুষ। তাঁর মতো দরিদ্র মানুষরা বেড়াতে যায় না। আর গেলেও তাদের দৌড় কক্সবাজার পর্যন্ত। আমেরিকায় যাবার পেছনে তাঁর তুচ্ছ একটা কারণ আছে। তিনি একজনের সঙ্গে দেখা করতে চান। দুই মিনিটের জন্যে দেখা হলেও হবে। তুচ্ছ কারণটা কি সাহেবকে বলা ঠিক হবে?

আপনি কী করেন?

শিক্ষকতা করতাম। সম্প্রতি অবসর নিয়েছি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেয়েছি। আগের কিছু সঞ্চয় আছে। আমার এক ছাত্র আছে ট্রাভেলিং এজেন্সিতে কাজ করে। সে সস্তায় টিকিট কিনে দেবে।

আপনার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে— তারা সঙ্গে যাবে না?

আমার স্ত্রী ছেলে কেউ নেই। আমি একা মানুষ। বিবাহ করি নাই।

আপনার পাসপোর্টে তো দেখি আর কোনো দেশের সিল নেই। দেশের বাইরে কখনো যান নি?

জি না।

আমেরিকার কোন জিনিসটা দেখার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ?

নায়াগ্রা জলপ্রপাতের নাম শুনেছি। এটা দেখার ইচ্ছা আছে।

গ্র্যান্ড কেনিয়ন দেখে আসবেন। দেখার মতো দৃশ্য। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে

এমট্রেকে চড়বেন— দুই থেকে আড়াইঘন্টা লাগবে। ট্রেন জার্নিটাও সুন্দর। অবজারভেশন ডেক আছে, আমেরিকা দেখতে দেখতে যাবেন।

জি আচ্ছা জনাব। তবে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে পারব বলে মনে হয় না। আমি খুব সামান্য টাকা পয়সা নিয়ে যাব। আমার এক ছাত্র থাকে মেরিল্যান্ডে, তার বাড়িতে থাকব। সে যেখানে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাব। এর বেশি আমার সাধ্য নাই।

বিকেল তিনটার সময় এসে পাসপোর্ট নিয়ে যাবেন।

জি আচ্ছা।

চারটা হাঁচি দিয়ে তিনি থেমে গিয়েছিলেন। এখন আবার শুরু হলো। তিনি হাঁচি দিয়েই যাচ্ছেন। আমেরিকান ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল— হাঁচির শব্দে ভালো শোনা গেল না। তিনি হাঁচতে হাঁচতেই ঘর থেকে বের হলেন। বক ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তাঁর হাত ধরল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ঘটনা কী ? ভিসা দিয়েছে ? না-কি রিজেকশন ?

জানি না।

পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে দিয়েছে ?

না। তিনটার সময় এসে নিয়ে যেতে বলেছেন।

বলেন কী! তাহলো তো ভিসা পেয়ে গেছেন। বলেছিলাম না পাবেন। তের নাম্বার আনলাকি এটা খুবই বোগাস কথা। পৃথিবীর সবচে' লাকি নাম্বার তের। হাঁচি বন্ধ করেন। এখন হাঁচির টাইম না।

তাঁর হাঁচি বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমার নামটা জানা হলো না।

আমার আগে নাম ছিল মোহাম্মদ জয়নাল হোসেন খন্দকার। এখন নাম পাল্টে রেখেছি রোজারিও গোমেজ জয়নাল। চার্চে গিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেছি। তারপর এফিডেবিট করে নাম বদলেছি।

সে-কী! কেন ?

খ্রিষ্টানদের জন্যে ভিসা পাওয়া খুব সুবিধা। আমার দুই বন্ধু খ্রিষ্টান হয়ে বিদেশে ভিসা পেয়ে চলে গেছে। একজন গেছে ফ্রান্সে, আরেকজন অস্ট্রেলিয়া।

ভিসার জন্যে খ্রিষ্টান হয়ে গেলে ?

উপরে উপরে হয়েছি। ভিতরে খাঁটি মুসলমান। সময় সুযোগ হলেই মাগরেবের নামাজটা পড়ি। তাছাড়া যিশু খ্রিষ্টও আমাদের নবী ছিলেন। আগে আমি একজন নবীর কেয়ারে ছিলাম। এখন দুইজনের কেয়ারে আছি।

খ্রিষ্টান হয়ে গেছ, বাবা-মা কিছু বলল না ?

বাবা-মা কেউ নাই। মামাদের সংসারে মানুষ হয়েছি। তারা এইসব কিছু জানেও না।

শামসুদ্দিন আবারো হাঁচতে শুরু করলেন। জয়নাল বলল, আপনার তো চাচাজি অবস্থা খারাপ, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। আপনি একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর বাসায় গিয়ে শান্তিমতো ঘুম দেন। আপনার কাজ তো হয়েই গেল। আসল জায়গায় ভিসা পেয়ে গেছেন। ইউরোপের যে-কোনো দেশের ভিসা এখন চোখ বন্ধ করে পাবেন। পাসপোর্টে আমেরিকান ভিসা দেখলে এরা ঝিম মেরে যায়। আপনি হলেন লাকি ম্যান অব দ্য সেঞ্চুরি।

তোমার ইন্টারভ্যু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি— তোমার কী হলো জেনে যাই। মনে হচ্ছে তোমার ভিসা পাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।

জয়নাল চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি অপেক্ষা করবেন ?

হ্যাঁ করব।

জয়নাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলল, কতক্ষণে ডাক আসে কে জানে!

সমস্যা নাই, অপেক্ষা করি। আমার কোনো জরুরি কাজ নাই।

তাহলে টিভির সামনে বসেন। একটা পর্যন্ত ইন্টারভ্যু চলে, তার আগেই ইনশাল্লাহ্ আমারটা হয়ে যাবে। চুপচাপ বসে না থেকে আমার জন্যে একটু দোয়া করেন। আপনি হলেন লাকি ম্যান অব দ্য সেঞ্চুরি। আপনার দোয়া আল্লাহ্ শুনবে।

আমি দোয়া করব।

জয়নাল কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে আবারো এসে তাঁর পাশে বসল। তখন তাকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। মুখ বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। শরীর ঘামছে। শামসুদ্দিন বললেন, কী ব্যাপার ?

অবস্থা খুবই খারাপ। তিন নম্বর ঘরে একটা মেয়ে ইন্টারভ্যু নিচ্ছে। যার ডাক সেই ঘরে পড়ছে সে-ই ধরা খাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে ঐ হারামজাদির ঘরেই ডাক পড়বে। খাজা বাবার দোয়া নিয়ে এসেছিলাম। এবারো হবে না কারণ খ্রিষ্টান হয়ে যাবার কারণে খাজা বাবা রাগ করেছেন।

আবার মুসলমান হয়ে যাও।

মুসলমান তো হয়েই আছি। নতুন করে কী হবো ? ভিসা পাওয়ার একটা কৌশল। খাজাবাবা এই সাধারণ জিনিসটা বুঝতে পারছেন না এটা একটা

আফসোস। স্যার, চলেন চা খাই। রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকান আছে, ভালো চা বানায়।

তোমার যদি ভিসা হয় আমাকে খবর দিও।

ভিসা হলেও খবর দিব, না হলেও খবর দিব। একটা পরিচয় যখন হয়েছে।

তুমি পড়াশোনা কতদূর করেছ?

দুবার ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে ধরা খেয়েছি। দুবারই নকলের ভালো সুবিধা পেয়েছিলাম। নিশ্চিন্ত মনে নকল করেছি। পরীক্ষার সময় টিচারও ভালো পেয়েছিলাম— নকলে হেল্প করেছেন। তারপরেও কিছু হয় নি। সবই কপাল! কপাল ফেটে তিন চার টুকরা হয়ে আছে। আমেরিকায় যেতে পারলে ফাটা কপাল জোড়া লাগাতাম। কপাল জোড়া লাগানোর আইকা গাম শুধুমাত্র সাদা চামড়াদের দেশেই পাওয়া যায়। আমার কপাল জোড়া লাগে— আল্লাহ্পাকের সেটাও ইচ্ছা না।

এখনই এত নিরাশ হয়ো না। হয়তো ভিসা পাবে।

পাব না। স্বপ্নেও দেখেছি পাব না। গত রাতে স্বপ্ন কী দেখেছি শুনলেই বুঝবেন। স্বপ্ন দেখেছি পুকুরপাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি— হঠাৎ পা পিছলে পুকুরে পড়ে গেছি। সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে যাব, সেখানে অদ্ভুত কিছু জন্তু দাঁড়িয়ে আছে— চ্যাপ্টা মুখ, বড় বড় দাঁত। পাড়ে উঠতে পারছি না। যতবার উঠতে চাই জন্তুগুলি লাথি দিয়ে ফেলে দেয়।

জয়নালের হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে শামসুদ্দিন সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিয়ম থাকলে তিনি অবশ্যই তাঁর পাসপোর্টটা ছেলেটার হাতে দিয়ে দিতেন এবং আনন্দের সঙ্গে বলতেন— যাও, আমেরিকায় যাও।

শামসুদ্দিন টিভির সামনে বসে আছেন। টিভিতে 'সিসেমিস স্ট্রিট' নামে শিক্ষামূলক কী একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। বকের মতো পোশাক পরা একটা লোক টেনে টেনে কথা বলছে। দেখতে ভালো লাগে না আবার খারাপও লাগে না। তাঁর ঝিমুনির মতো এসে গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়লেন নিজেও জানেন না। ঘুমের মধ্যে লম্বা চওড়া এক স্বপ্নও দেখে ফেললেন। স্বপ্নে নৌকায় করে নানার বাড়ি যাচ্ছেন। নৌকার মাঝি দেখতে সিসেমিস স্ট্রিটের বকের মতো। নৌকা চালাবার ফাঁকে ফাঁকে সে তার লম্বা ঠোঁটটা দিয়ে শামসুদ্দিনের পেটে খোঁচা দিয়ে দিয়ে বলছে— ও চৈতার বাপ। ঘুমাও কেন? নদীর দুই ধারে সুন্দর সুন্দর সিনারি। সিনারি দেখ। ও চৈতার বাপ।

চৈতার বাপ তাঁর শৈশবের একটা নাম। এই নামে তার বাবা তাকে ডাকতেন। এই অদ্ভুত নামটা তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে কেন দিয়েছিলেন শামসুদ্দিন সেটা জানেন না। তার ডাক নামটা খুবই অদ্ভুত এটা বোঝার আগেই তার বাবা মারা গেলেন। অদ্ভুত নামের রহস্য আর জানা হলো না। নামটা শামসুদ্দিন সাহেব নিজেও ভুলে গিয়েছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর আমেরিকান এম্বেসির ভিসাপ্রার্থীর ওয়েটিং রুমে ছেলেবেলার নামটা ঘুমের মধ্যে মনে পড়ল।

বকের মতো মাঝিটা বড় বিরক্ত করছে। ক্রমাগত 'চৈতার বাপ চৈতার বাপ' বলে গায়ে খোঁচা দিচ্ছে। শামসুদ্দিন বিরক্ত হয়ে চোখ মেলে দেখলেন জয়নাল তার গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। জয়নালের চোখ ভেজা। তার হাত-পা কাঁপছে। তিনি লক্ষ করলেন তাদের ঘিরে কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে আছে।

শামসুদ্দিন দুঃখিত গলায় বললেন, ভিসা হয় নি ?

জয়নাল জবাব দিল না। তার মুখ অস্বাভাবিক করুণ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ছেলেটা এখনই কেঁদে ফেলবে।

ঐ মেয়েটার ঘরে ডাক পড়েছিল ? তিন নম্বর ঘর ?

জি।

কী বলে ছেলেটাকে সান্ত্বনা দেবেন শামসুদ্দিন বুঝতে পারছেন না। সান্ত্বনার দু'একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে। জয়নাল উদাস গলায় বলল, চলুন বের হই।

চল। বেশি মন খারাপ করো না।

জয়নাল বলল, আপনি কি এখনই বাসায় চলে যাবেন ? পাঁচটা মিনিট আমার সঙ্গে থাকেন। এক কাপ চা খান। চায়ের পয়সা আমি দিব।

বেশতো চল।

দুর্গের ভেতর থেকে তারা বের হয়েছেন। ছেলেটা মাথা নিচু করে হাঁটছে। একবার সার্টের হাতায় চোখ মুছল। শামসুদ্দিনের মনটা অস্বাভাবিক খারাপ হয়ে গেল। তিনি ছেলেটার পিঠে হাত রাখলেন।

জয়নাল বলল, আপনি কোথায় থাকেন ঠিকানাটা বলুন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। ইনশাল্লাহ দুইজন একসঙ্গেই আমেরিকা যাব। আপনি খুবই নরম লোক— আপনাকে গাইড না করলে বিরাট বিপদে পড়বেন।

শামসুদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, ভিসা ছাড়া তুমি আমেরিকা যাবে কীভাবে ?

জয়নাল লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চাচা মিয়া, আমার ভিসা হয়েছে। অনেক লোকজন ছিল তো এই জন্যে কিছু বললাম না। তাদের চোখ লাগতে

পারে। হয়তো কারো চোখ লেগে গেল— দেখা যাবে শেষ মুহূর্তে কিছু একটা হয়েছে। পাসপোর্টে সিল পড়ে নাই।

ঐ মেয়ে তোমাকে ভিসা দিয়েছে ?

জি। কিছুই জিজ্ঞেস করে নাই। একবার শুধু মুখের দিকে তাকাল। খসখস করে একটা কাগজে কী যেন লিখল। তারপর বলল, তিনটার সময় এসে পাসপোর্ট নিয়ে যেও।

জয়নালের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। অথচ মুখটা হাসি হাসি। নান্দাইল হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শামসুদ্দিন সাহেবের মনে হলো— তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে যে অল্প ক'টি অসাধারণ দৃশ্য দেখেছেন এটি তার একটি। তাঁর নিজের চোখেও পানি এসে গেল।

কৈ মাছের তরকারিটা খেতে এত ভালো হয়েছে!

শামসুদ্দিনের মনে হলো গত দশ বছরে তিনি এমন রান্না খান নি। ছোট ছোট আলু দিয়ে রান্না। ধনেপাতার হালকা গন্ধ। কাঁচা মরিচের ঝাল। ঝালটা জিভে লেগে থাকে, কখনো মিলায় না। টমেটোও দেয়া হয়েছে। টমেটো গলে যায় নি। আস্ত আছে। গলে গেলে কৈ মাছে টক ভাব চলে আসত, সেটা আসে নি। কৈ মাছের সালুনকে অঙ্কের মতো ছাকা নাম্বার দিতে হবে। দশে দশ।

বাটিতে একটাই মাঝারি সাইজের কৈ মাছ। তাঁর আরেকটা মাছ চাইতে ইচ্ছা করছে। অনেক কষ্টে ইচ্ছা দমন করছেন। রাহেলার বাড়িতে সব কিছু হিসাব করা।

রাহেলা তাঁর বোন।

আপন বোন না, খালাতো বোন। শামসুদ্দিনের বড় খালা হামিদা বানুর ছোট মেয়ে। শামসুদ্দিন বড় হয়েছেন হামিদা বানুর কাছে। এই মহিলার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তারপরেও শামসুদ্দিনের জন্যে তাঁর মমতার কোনো রকম ঘাটতি ছিল না। শামসুদ্দিন বোনের বাড়িতে আছেন চার বছর ধরে। অভাবি সংসার সামলাতে গিয়ে রাহেলা যে পুরোপুরি বিপর্যস্ত এটা তিনি চোখের সামনে দেখছেন কিন্তু কিছু করতে পারছেন না। মাসের দুই তারিখে তিনি রাহেলার হাতে পনেরশ টাকা দেন। রাহেলা হাত পেতে টাকা নিতে নিতে বলে— এ-কী! টাকা দিচ্ছ কেন ? তুমি কি আমার বাড়িতে পেইং গেস্ট যে মাসের প্রথমেই খরচ দেবে ? আমার দরকার হলে আমি তো চেয়ে নিবই। তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে আমার কি কোনো অসুবিধা আছে ?

শামসুদ্দিন জানেন সবই কথার কথা। তাঁর পনেরশ টাকা রাহেলা সংসার খরচে ধরে রেখেছে। প্রতিটি টাকাই হিসাবের টাকা। শামসুদ্দিনের প্রায়ই ইচ্ছা করে পাঁচ দশ হাজার টাকা রাহেলার হাতে তুলে দিয়ে বলেন— নে, তুই ইচ্ছামতো খরচ কর। পছন্দ করে শাড়ি কিনে আন, স্যান্ডেল কিনে আন। বাচ্চাদের নিয়ে কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে যা। এতগুলি টাকা এক সঙ্গে হাতে পেয়ে রাহেলা কী করে এটা তাঁর দেখার ইচ্ছা। কাজটা করা হয় নি। তবে

ভবিষ্যতে করবেন। অবশ্যই করবেন। সব মিলিয়ে ব্যাংকে তাঁর আছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। আমেরিকার জন্য এক লাখ টাকা ধরা আছে। তার পরেও হাতে থাকবে দুই লাখ পঁচাত্তর।

রাহেলা এসে তাঁর সামনে বসেছে। শামসুদ্দিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গেলেন। রাহেলার মুখ থমথম করছে। রফিকের সঙ্গে বড় ধরনের কোনো ঝগড়াঝাটি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিছুদিন পরপর ওরা ঝগড়া করছে। খুব ভুল কাজ হচ্ছে। রাহেলার সন্তান হবে। ছয় মাস চলছে। এই সময় মায়ের মেজাজ খারাপ থাকলে মায়ের পেটের সন্তানের ক্ষতি হয়।

শামসুদ্দিন বললেন, রাহেলা মন খারাপ নাকি ?

রাহেলা চাপা গলায় বলল, না।

মুখ এত গম্ভীর করে রেখেছিস কেন ? শরীর খারাপ লাগছে ? শরীর খারাপ লাগলে রেস্ট নে। শুয়ে থাক। আমার সামনে বসতে হবে না। একা খেয়ে আমার অভ্যাস আছে।

রাহেলা সরাসরি শামসুদ্দিনের চোখের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, ভাইজান, তুমি নাকি আমেরিকা যাচ্ছ ?

শামসুদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন, হুঁ।

কবে যাচ্ছ ?

যাওয়ার তারিখ এখনো ঠিক হয় নি। ভিসা হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছা করলে যে-কোনো দিন যেতে পারি। বিমানের টিকিট কাটতে হবে।

টিকিট কাটতে কত লাগবে ?

ঠিক জানি না। সত্তুর আশি হাজার টাকা লাগবে।

আমেরিকায় থাকবে কোথায় ?

সস্তার হোটেল মোটেল খুঁজে বের করব। আমার কিছু ছাত্র আছে। ওদের ঠিকানা নিয়ে যাব।

আমেরিকায় যাচ্ছ কেন ?

এই এমনি আর কী। বেড়াতে যাচ্ছি। এই জীবনে কিছুই তো দেখলাম না। নিজের দেশের দক্ষিণের পুরোটাই সমুদ্র। সেই সমুদ্রও দেখা হলো না।

শুধু বেড়ানোর জন্যে আমেরিকা যাচ্ছ ?

শামসুদ্দিন চুপ করে রইলেন। শুধু বেড়ানোর জন্যে আমেরিকা যাচ্ছেন এটা বললে মিথ্যা বলা হবে। সামান্য বিষয় নিয়ে মিথ্যা বলা ঠিক হবে না।

রাহেলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুমি আমেরিকায় যাবে এই খবরটা গোপন করলে কেন ?

শামসুদ্দিন বিব্রত গলায় বললেন, গোপন করি নি তো। গোপন করব কেন ?

অবশ্যই তুমি গোপন করেছ। তুমি যে আমেরিকায় যাবার প্ল্যান করেছ সেটা কাউকে জানাও নি। পাসপোর্ট করেছ, ভিসা করেছ— তাও জানাও নি। আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম। এখন বলো কেন আমার কাছে গোপন করলে ? আমি তোমার আপন বোন না। অনেক দূরের বোন। এই জন্যে ?

বলার সুযোগ হয় নি। ভিসা পাব কী পাব না তারই ঠিক ছিল না।

রাহেলার চোখে পানি এসে গেছে। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, তোমার কি ধারণা তুমি আমেরিকা যাচ্ছ শুনে আমি ঘ্যানঘ্যান শুরু করব— আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল ? ভুল কথা ভেবেছ ভাইজান। আমি স্বামীর সংসারে ঝি-গিরি করার ভাগ্য নিয়ে এসেছি। আমি তোমার সঙ্গে প্লেনে উঠব এরকম কল্পনাও আমার নেই।

শামসুদ্দিন হতাশ গলায় বললেন, তুই শুধু শুধু আমার সঙ্গে রাগ করছিস।

রাহেলা কঠিন গলায় বলল, তুমি ভুল বলছ ভাইজান। আমি তোমার উপর রাগ করব কেন ? তুমি কে ? তুমি আমার কেউ না— শুধু দূরসম্পর্কের বড় ভাই। বোনের বিয়ে হবার পর আপন ভাই আর ভাই থাকে না, বাইরের মানুষ হয়ে যায়। তুমি অনেক দূরের ভাই। বাইরের একজন মানুষ।

আমি বাইরের মানুষ ?

অবশ্যই বাইরের মানুষ। পনের শ টাকা খরচ দিয়ে খাও দাও ঘুমাও। আমার সংসার কীভাবে চলছে তুমি কিছু জানো ? না, জানো না।

তুই খারাপ অবস্থায় আছিস এটা জানব না কেন ? রফিকের ব্যবসাপাতি খারাপ যাচ্ছে, সবই জানি।

ভাইজান, তুমি কিছুই জানো না। তোমার জানার দরকারও নাই। বাসায় একটা রঙিন টেলিভিশন ছিল। নষ্ট হয়ে গেছে, ওয়ার্কশপে সারাতে দেয়া হয়েছে। এটা তুমি জানো, তাই না ?

হুঁ।

তুমি আসল ঘটনা জানো না। রঙিন টিভি নষ্ট হয় নাই। সারাতেও দেয়া হয় নাই। বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। আগে তো পেটে ভাত, তারপরে না রঙিন টিভি।

বলিস কী ?

এতেই চমকে উঠলে! আরো ঘটনা শুনবে ? আচ্ছা বেশ, শোন। বলতে যখন বসেছি সবই বলব। রাখ ঢাক করব না। তোমাকে লজ্জাও করব না। তুমি কে ? তুমি কেউ না। তুমি বাইরের একজন পেয়িং গেস্ট। নিজের ভাই হলে তোমাকে লজ্জা করার কথা আসত।

শামসুদ্দিন হতাশ গলায় বললেন, রাহেলা তুই খুবই উত্তেজিত। এই সময় উত্তেজনা ভালো না। আরেকদিন সব শুনব।

রাহেলা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তোমাকে আজই শুনতে হবে। আজ বলতে না পারলে আমি আর কোনো দিনই বলতে পরব না। পৃথুর বাবার সম্পর্কে কথা।

কী কথা ?

গত মাসের নয় তারিখ বিষ্যুদবার রাত তিনটার সময় আমার ঘুম ভেঙে গেছে। দেখি বিছানায় পৃথুর বাবা নাই। তাঁর খোঁজে বিছানা থেকে নামলাম, কোথাও সে নাই। তারপর তাকে কোথায় পেলাম জানো ? বুয়ার ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

শামসুদ্দিন হতভম্ব গলায় বললেন, সে-কী!

রাহেলা চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমি তারপরেও এই বাসায় পড়ে আছি। কারণ আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। আমার মা নাই, বাবা নাই। আমার এক খালাতো ভাই আছে। তারও কোনো মেরুদণ্ড নাই। সে থাকে আমার সাথে। তার মনে মনে ভালো ভালো চিন্তা। সে আমেরিকা যাবে। হাফপ্যান্ট পরা মেমসাহেব দেখবে। মেম সাহেবদের সাদা সাদা পা দেখে তার ফূর্তি হবে।

রাহেলা আমার কথা শোন...

তোমার তো কোনো কথা নাই ভাইজান। তোমার কথা আমি কী শুনব ? তুমি আমার কথা শুনবে। পৃথুর বাবার লজ্জা তো ভেঙে গেছে, এখন কী করে জানো ? প্রায় রাতেই বুয়ার ঘরে যায়। আমাকে বলে দিয়েছে এই নিয়ে যদি কোনো কথা বলি তাহলে বাসা থেকে বের করে দিবে। বাসা থেকে বের করে দিলে আমি যাব কোথায় ?

দরজায় কলিং বেল বাজছে। রফিক এসেছে। রাহেলা চোখ মুছে উঠে গেল। শামসুদ্দিন ভেবেই পেলেন না রফিকের মতো ভালো একটা ছেলে এমন জঘন্য কাজ কীভাবে করে। রাহেলা ভুল করছে না তো ? মেয়েরা এমনিতেই সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হয়। পেটে সন্তান থাকা অবস্থায় সন্দেহ রোগ অনেকগুণে বেড়ে যায়। হয়তো রফিকের রাতে পানির পিপাসা পেয়েছে। পানি খাবার জন্যে

সে গিয়েছে রান্না ঘরে আর তাতেই যা ভাবার না রাহেলা তাই ভেবে বসে আছে। কাইক্যা মাছকে ভেবেছে কুমির। রাহেলা যা বলছে তা হতেই পারে না। রফিক এরকম ছেলেই না। তা ছাড়া যে বুয়াকে নিয়ে কথা হচ্ছে তাকে নিয়ে কোনো কিছুর ভাবারই অবকাশ নেই। কালো, ঠোঁট, মোটা, মধ্যবয়স্ক মহিলা। মুখ ভর্তি বসন্তের দাগের মতো দাগ।

রাতের খাবার শেষ করে ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই শামসুদ্দিন শুয়ে পড়েন। রফিকের সঙ্গে তার দেখাই হয় না। সে কখনো রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার আগে বাসায় ফিরে না। যেদিন সকাল সকাল বাড়ি ফেরে সেদিন রফিক অবশ্যই একবার শামসুদ্দিনের ঘরে আসে। বিছানায় পা তুলে বসে জমিয়ে গল্প করে। পান সিগারেট খায়। সময়টা শামসুদ্দিন সাহেবের ভালো কাটে। রফিক মাঝে মাঝে এমন সব হাসির গল্প বলে যে হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা শুরু হয়।

শামসুদ্দিন ঘড়ি দেখলেন। দশটা চল্লিশ। রফিক আজ সকাল সকাল ফিরেছে। কাজেই একবার নিশ্চয়ই তার ঘরে আসবে। যদি আসে তাহলে কি তিনি তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারবেন? তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সবচে ভালো হয় তিনি যদি বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রফিক নিশ্চয়ই গল্প করার জন্যে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে না। পরপর কয়েকদিন দেখা না হলে খুব ভালো হয়। এর মধ্যে রাহেলা তার ভুল বুঝতে পারবে। কাজের মেয়েটাকে বিদায় করার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে।

ভাইজান জেগে আছেন?

বলতে বলতে রফিক হাসি মুখে ঢুকল। তার মুখ ভর্তি পান। মুখ থেকে জর্দার গন্ধ আসছে। হাতে দুটা সিগারেট। শামসুদ্দিনের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে রফিক বলল, বিয়ে খেয়ে এসেছি। এলাহী ব্যবস্থা। বিয়ের খাওয়ার পর চা কফি আছে, পান আছে। দু'টা বাচ্চা মেয়ে আবার ট্রে ভর্তি সিগারেট নিয়ে ঘুরছে। যার ইচ্ছা সিগারেট নিচ্ছে। আমার ইচ্ছা ছিল এক সঙ্গে চারপাঁচটা নেই। শেষে লজ্জা লাগল, দুটা নিলাম। ডানহিল সিগারেট। দু'টাই রেখে দিয়েছি আপনার সঙ্গে খাব বলে।

শামসুদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন, কার বিয়ে?

আমার এক বন্ধুর শালার বিয়ে। ট্রাকের ব্যবসা করে দুহাতে মাল কামিয়েছে। শরীর থেকে কাঁচা টাকার গন্ধ আসছে। ভাইজান, আপনি নাকি আমেরিকা যাচ্ছেন? রাহেলার কাছে শুনলাম। সত্যি নাকি?

হুঁ।

খুব ভালো। ভিসা হয়েছে ?

হুঁ।

তাহলে ভাইজান আমার একটা উপদেশ শোনেন। আমেরিকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। দেশে আসার নামও করবেন না।

তা কী করে হয়! ঐ দেশে আমি করব কী ?

কিছুই করতে হবে না। মাটি কামড় দিয়ে পড়ে থাকবেন। যদি দেখেন কিছুই হচ্ছে না, না খেয়ে আছেন— তাহলে কোনো এক আমেরিকান মহিলাকে সবার সামনে চড় লাগাবেন, মুখে থুথু দিয়ে দেবেন।

কেন ?

এতে লাভ আছে। পুলিশ এসে আপনাকে ধরে নিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। আরামে জেলে থাকবেন। ওদের জেলখানাও আমাদের থ্রি স্টার হোটেলের মতো। এলাহি কারবার। সকালে ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে তিনটা মুভি দেখায়। প্রতিদিন বিকেলে খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। খাবার খুবই ভালো।

তুমি ওদের জেলের ব্যাপার জানলে কীভাবে ?

ছবিতে দেখেছি। কমনসেন্স সে-রকমই বলে। বেহেশতে যদি জেলখানা থাকে সেই জেলখানাও তো বেহেশতের মতোই হবে।

আমেরিকা বেহেশত নাকি ?

অবশ্যই বেহেশত।

শামসুদ্দিন রফিকের দিকে অবাক হয়েই তাকিয়ে আছেন। কী সুন্দর রাজপুত্রের মতো চেহারা। কী সুন্দর হাসিখুশি স্বভাব। রাহেলা ভুল করছে। অভাবে স্বভাব নষ্ট যে বলে তাই হয়েছে। রাহেলার স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে। মন হয়েছে ছোট। যা দেখছে সবই ছোট চোখে দেখছে।

ভাইজান।

হুঁ।

আপনাকে চিন্তিত লাগছে কেন ?

চিন্তিত না তো।

অবশ্যই আপনি চিন্তিত। দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করতে হবে ভাইজান। আমাদের সকল সমস্যার মূলে আছে দুশ্চিন্তা। ব্লাড প্রেসার, হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস... শুরুটা দুশ্চিন্তায়।

তোমার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কী ?

ভালো না। লাক ফেভার করছে না। এক জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলাম; সে বলল, আরো দুই বছর এই অবস্থা যাবে। তৃতীয় বছর থেকে পালে বাতাস লাগবে। দু'টা বছর পার করাই সমস্যা। আপনাকে দেখে ভাইজান হিংসা হয়— একা মানুষ, নিজেই সরকার প্রধান, নিজেই বিরোধী দলের প্রধান। যখন যা ইচ্ছা করতে পারেন। ঐ গানটা শুনেছেন— স্ত্রী হইল হাতের বেড়ি, পুত্র ঘরের খিল ?

না।

খুবই বাস্তব গান। আপনি গানের মর্ম বুঝবেন না, কারণ আপনার স্ত্রী পুত্রের কারবারই নাই। আমারা যারা বিবাহিত তারা এই গানের মর্ম হাড়ে হাড়ে বুঝি।

অসুখী বিবাহিত পুরুষ হয়তো বুঝে। সুখী যারা তাদের বোঝার কথা না। তাদের কাছে সংসার অতি আনন্দের ব্যাপার।

রফিক খাট থেকে নামতে নামতে বলল, সংসার কোনো আনন্দের ব্যাপার না ভাইজান। খুবই নিরানন্দের ব্যাপার। সংসার মানেই দ্বীপান্তর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। যাই, আপনি ঘুমিয়ে পড়েন।

শামসুদ্দীন ঘুমুবার আয়োজন করলেন। মশারির ভেতর তিনি ঘুমাতে পারেন না। বাধ্য হয়ে কিছুদিন ধরে মশারির ভেতর ঘুমাতে হচ্ছে। খুব মশার উপদ্রব। তিনি মশারি ফেলে মশারির ভেতর ঢুকে পড়লেন। বালিশের কাছে এক বোতল পানি রাখলেন। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলেই তার পানির পিপাশা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পানি না খেলে মনে হয় বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। দুঃস্বপ্ন ইদানীং ঘন ঘন দেখছেন। একটাই দুঃস্বপ্ন— তিনি ট্রেন লাইন দিয়ে হাঁটছেন, পেছনে ট্রেন ছুটে আসছে। তিনি দৌড়াতে শুরু করেছেন। ট্রেন লাইন থেকে নেমে গেলে হয়। তিনি নামছেন না, লাইন বরাবর দৌড়াচ্ছেন। পেছন থেকে আসছে আন্তঃনগর ট্রেন। এই স্বপ্নটাই নানান ভাবে নানান ভঙ্গিমায় দেখছেন। কখনো তিনি একা। কখনো তার হাত ধরে থাকে বাচ্চা একটা ছেলে। কখনো বা দেখেন তিনি রেল লাইনের স্লিপারে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন।

রাত প্রায় বারোটা। তিনি এখনো জেগে আছেন। তাঁর সামান্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। যদি রাত একটার ভেতর ঘুম না আসে তাহলে বাকি রাত আর ঘুম হবে না। এই বয়সে অনিদ্রা রোগ হয়। এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না, বরং একদিক দিয়ে ভালো— নানান বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা যায়। তাঁর চিন্তা করতে খারাপ লাগে না তবে তাঁর সমস্যা হলো ছোট্ট ঘরটার ভেতর বসে থাকতে হয়। তাঁর ঘরটা মূল বাসার সঙ্গে যুক্ত না। আলাদা। মূল দরজা বন্ধ করে দিলে তাঁকে

তাঁর ঘরেই বসে থাকতে হয়। বারান্দাও নেই যে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবেন। তাঁর ঘরটা যদি মূল বাড়ির অংশ হতো তাহলে অনিদ্রা রোগে কোনো সমস্যা হতো না। হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন। চা খেতে ইচ্ছা হলে রান্নাঘরে চুপি চুপি চলে যেতেন। নিঃশব্দে চা বানিয়ে বসার ঘরের বেতের সোফায় বসে থাকতেন। তাঁর নিজের একটা ছোটখাটো টিভি থাকলে ভালো হতো। টিভিটা মশারির ভেতর নিয়ে খাটে আধশোয়া হয়ে টিভি দেখতেন। আজকাল নানান চ্যানেল হয়েছে। সারারাতই না-কি টিভি চলে।

একটা বেজে গেছে। ঘুম আর হবে না। শামসুদ্দিন খাট থেকে নামলেন। বাতি জ্বালালেন। আবার এসে মশারির ভেতর ঢুকে পড়লেন। অনিদ্রার রোগী কখনো অন্ধকারে থাকতে পারে না।

কোনো একটা বিষয় নিয়ে এখন আয়োজন করে চিন্তা শুরু করা যেতে পারে। 'চৈতার বাপ' নিয়েই চিন্তা করা যায়। আচ্ছা, আদর করে কেউ কখনো নিজের ছেলেকে চৈতার বাপ ডাকে ? চৈতাটা কে ? কোনো মানুষের নাম, নাকি চৈত্র মাস থেকে চৈতা ? তাঁর জন্ম তো চৈত্র মাসে হয় নি। জন্ম হয়েছে আষাঢ় মাসে। তাহলে নাম চৈতার বাপ কেন ? তাঁর মন খারাপ লাগছে বাবাকে এই প্রশ্নটা করা হয় নাই।

খট করে শব্দ হলো। কে যেন সদর দরজা খুলল। খালি পায়ে এগিয়ে আসছে। কে হতে পারে ? শামসুদ্দিন সাহেব কান খাড়া করলেন। তাঁর ঘরের দরজায় কে যেন হাত রাখল। শামসুদ্দিন বললেন, কে ?

রাহেলা বলল, ভাইজান আমি। দরজা খুলুন।

শামসুদ্দিন দরজা খুললেন। রাহেলা বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শামসুদ্দিন বললেন, কী হয়েছে ? রাহেলা বলল, আমার কিছু হয় নি। তোমার কী হয়েছে বলো। রাত দু'টা বাজে, বাতি জ্বালিয়ে রেখেছ কেন ?

ঘুম আসছে না।

বাতি জ্বালিয়ে রাখলে ঘুম আসবে কেন ? বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকলেই না ঘুম আসবে।

রাহেলা ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, তোমার আমেরিকা যাবার তারিখ কি ঠিক হয়েছে ?

না।

মনে করে তুমি তোমার হাঁচি রোগের চিকিৎসা করে আসবে। ওদের চিকিৎসা নিশ্চয়ই ভালো।

চিকিৎসা ভলো হলেও খুবই খরচান্ত ব্যাপার। আর হাঁচি রোগ এমন না যে চিকিৎসা না হলে মারা যাব।

এক নাগাড়ে একশ' হাঁচি দাও— এই রোগ খারাপ না তো কোন রোগ খারাপ ? ভাগ্যিস তুমি বিয়ে কর নি।

বিয়ে করলে সমস্যা কী হতো ?

বাসর রাতে একশ দেড়শ হাঁচি দিতে। হাঁচি শুনে বউ-এর কলজে শুকিয়ে যেত।

শামসুদ্দিন কিছু বললেন না। রাহেলার গোলগাল মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বড় বড় চোখ। গোলগাল মুখ। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। তার মুখে শিশুসুলভ সরলতা আছে। কিছু কিছু মানুষের চিন্তা চেতনা থেকে সারল্য চলে যায় কিন্তু তারা তা চেহারায় ধরে রাখে। রাহেলা তার চেহারায় ধরে রেখেছে।

ভাইজান, আমার প্রায়ই কি মনে হয় জানো ? আমার মনে হয় মা'র কথাটা আমার শোনা উচিত ছিল। মা'র কথা না শুনে বিরাট ভুল করেছি।

উনার কোন কথা ?

রাহেলা মাথা নিচু করে অস্পষ্ট স্বরে বলল, মারা যাবার আগে আগে মা আমাকে বলল— তুই শামসুকে বিয়ে করিস। সে আলাভুলা মানুষ। তোর হাতে থাকলে ঠিক থাকবে।

শামসুদ্দিন চুপ করে গেল। খুবই অস্বস্তিকর একটা প্রসঙ্গ। রাহেলা এই প্রসঙ্গ মাঝে মাঝেই তুলে।

রাহেলা বিড়বিড় করে বলল, তুমি বয়সে আমার অনেক বড়, তারপরেও আমার কোনো আপত্তি ছিল না। মা মরার সময় একটা কথা বলে গেছে— আমি আপত্তি করব কেন ? কিন্তু মা যে এই কথা আমাকে বলে গেছে এই কথাটাই কেউ বিশ্বাস করল না। সবাই ভাবল আমার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে। এই জন্যেই বানিয়ে বানিয়ে এই ধরনের কথা বলেছি। আমাকে নিয়ে সবার কী হাসাহাসি!

শামসুদ্দিন বললেন, রাহেলা ঘুমুতে যা, রাত অনেক হয়েছে।

রাহেলা বলল, ভাইজান রাত জাগলে ক্ষিধে পায়। তোমার কি ক্ষিধে পেয়েছে ?

না।

রাতে ভালোমতো খেতেও পার নি। আমার উল্টাপাল্টা কথা শুনে তোমার খাওয়া হয়ে গেল বন্ধ।

ঠিকমতোই খেয়েছি। কৈ মাছের ঝোল খুব ভালো হয়েছিল।

এক পিস কৈ মাছ এখনো আছে। ভাত গরম করে আনি, খাও।

আরে না। তুই পাগল না-কি! এক রাতে কয়বার খাব?

যতবার ক্ষিধে লাগবে ততবার খাবে। আমার যখন ঘুম হয় না তখন রাতে ক্ষিধে লাগে। আমি ভাত গরম করে ডিম ভেজে খেয়ে নেই।

তোরও কি অনিদ্রা রোগ আছে?

রাহেলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, যে মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে অনিদ্রা রোগ তো হবেই। এখন আমি পৃথুর বাবাকে পাহারা দেবার জন্যে জেগে থাকি। ভান করি যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। আসলে জেগে থাকি।

এরকম করলে তো তোর শরীর খারাপ করবে। এই সময়ে শরীর খারাপ করা ঠিক না।

রাহেলা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, আমি চাই শরীর খারাপ হোক। আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না ভাইজান। অনেক দিন থেকেই করে না। কতজনের কাছে শুনি পোয়াতি অবস্থায় বাথরুমে পা পিছলে পড়েছে। এবরশন হয়ে গেছে। রক্ত যেতে যেতে মৃত্যু। আমি আমার বাথরুমটা ইচ্ছা করে পানি দিয়ে সারাক্ষণ ভিজিয়ে রাখি। পৃথুর বাবা দু'দিন পা পিছলে পড়ে ব্যথা পেয়েছে। আমার এখন পর্যন্ত কিছু হয় নি।

এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা করিস না।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়। বাতি জ্বালানো থাকলে কোনোদিনই ঘুম আসবে না। আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে। ঘুমের ওষুধ দেব?

না।

রাহেলা শামসুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, ভাইজান শোন, তোমাকে গোপন একটা কথা বলি— আমার কাছে সাতচল্লিশটা ঘুমের ট্যাবলেট আছে।

শামসুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

রাহেলা বলল, ঘুমের ওষুধ মানুষ কী জন্যে রাখে? ঘুমাবার জন্যে। আমি ঠিক করে রেখেছি আমার পেটে যে যন্ত্রণাটা আছে সেই যন্ত্রণা খালাস হবার পর আমি শান্তিমতো ঘুমাব। দুই তিনটা ট্যাবলেটে শান্তির ঘুম হবে না। ঘুম ভেঙে যাবে। ঘুম যাতে না ভাঙে সেই ব্যবস্থা নিয়ে ঘুমাব।

তোর মাথা আসলেই খারাপ হয়েছে।

মাথা খারাপ হয় নাই ভাইজান। মাথা খারাপ মানুষ ঘুম-অঘুম নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের কাছে ঘুমও যা জেগে থাকাও তা। সুস্থ মানুষই ঘুম-অঘুম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। আমি খুবই সুস্থ মানুষ। ভাইজান, বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে যাও।

রাহেলা তার ঘরে ঢুকল। সেখানেও বাতি জ্বলছে। খাটে পা ঝুলিয়ে রফিক বসে আছে। রফিকের গা ঘেঁসে পৃথু বসে আছে। সে গম্ভীর ভঙ্গিতে পা দোলাচ্ছে। মাকে দেখে সে পা দোলানো বন্ধ করল। ভীত চোখে তাকিয়ে রইল মা'র দিকে। পৃথুর বয়স সাত বছর। সে মা'কে খুবই ভয় পায়।

রফিক বলল, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে। পৃথু বিছানা ভিজিয়ে ফেলেছে। ভেজা বিছানায় তো আর শোয়া সম্ভব না কাজেই তাকে আমাদের বিছানায় নিয়ে এসেছি। সে আমাদের দু'জনের মাঝখানে হাইফেন হয়ে শুয়ে থাকবে। কী রে বাবা, পারবি না?

পৃথু প্রবল বেগে মাথা নেড়ে জানাল যে সে পারবে। রাহেলা কঠিন গলায় বলল, গরমের মধ্যে চাপাচাপি করে তিন জন ঘুমাতে পারব না। পৃথু তার নিজের ঘরেই ঘুমাবে। ভেজা বিছানাতে শুয়ে থাকবে। এটা তার বিছানা ভেজানোর শাস্তি। এত বড় ছেলে হয়েছে এখনো বিছানা ভেজানো? তাকে তো কানে ধরে চাবকানো দরকার।

রফিক বলল, ইচ্ছা করে তো বিছানা ভেজায় না। রাহেলা শোন, ও একা ঘুমুতে ভয় পাচ্ছে, আমি ওর সঙ্গে গিয়ে ঘুমাই।

রাহেলা কঠিন গলায় বলল, তুমি আমার সঙ্গে এই ঘরে থাকবে।

নো প্রবলেম। এক কাজ করলে কেমন হয়— তোমরা দু'জন খাটে শোও, আমি মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়ে পড়ি।

রাহেলা জবাব দিল না। রফিক আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, এত রাতে ভাইজানের সঙ্গে কী নিয়ে আলাপ করছিলে?

রাহেলা বলল, ভয় নাই, কোনো ষড়যন্ত্র করছিলাম না। ভাইজান ষড়যন্ত্রের মানুষ না।

রফিক বলল, কী বলছ! ষড়যন্ত্রের কথা আসছে কেন?

যে যে-রকম, অন্যকে সে সে-রকমই ভাবে। এই জন্যেই ষড়যন্ত্রের কথা আসছে। তুমি যে আমাকে আর ভাইজানকে নিয়ে সন্দেহ কর এটাও আমি জানি।

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, সন্দেহ কেন করব? ছিঃ ছিঃ।

কথায় কথায় ছিঃ ছিঃ করবে না। তোমার মন যে কত ছোট সেটা আর কেউ না জানলেও আমি জানি।

রফিক চুপ করে গেল। পৃথু আবার পা দোলাতে শুরু করেছে। তাকে একা একা আলাদা একটা ঘরে ঘুমুতে হবে না এই আনন্দেই সে আনন্দিত। মেঝেতে যখন বিছানা হচ্ছে তখন এই বিষয়টা নিশ্চিতই হচ্ছে। পৃথুর ইচ্ছা করছে বাবার সঙ্গে ঘুমুতে। মেঝের বিছানাটা বেশ ভালো হচ্ছে। তাছাড়া বাবার সঙ্গে ঘুমানোর আনন্দও আছে। বাবার উপর পা তুলে দিলে বাবা কিছুই বলে না। মায়ের গায়ে পা তোলা যায় না। মা ধমক দিয়ে বলেন— 'গাবদা পা সরা।' 'গাবদা' পা জিনিসটা কী পৃথু জানে না। তারপরেও সে নিশ্চিত যে তার পা গাবদা না। পৃথুর পা মোটেই গাবদা না।

রাহেলা বাথরুমে ঢুকে গেছে। কল ছেড়ে দিয়ে ক্রমাগত মুখে পানি ঢালছে। প্রায়ই তার শরীর জ্বালা করে। এই সময় মুখে পানি দিতে হয়।

কলের পানির শব্দটা পৃথুর ভালো লাগছে। বাবার সঙ্গে এখন ফিস ফিস করে কথা বললে মা শুনতে পাবে না। পৃথু চাপা গলায় ডাকল, বাবা।

রফিক ছেলের দিকে তাকিয়ে পৃথুর মতোই গলা চাপা করে বলল, কী?

আমি তোমার সঙ্গে ঘুমুব।

খুবই ভালো কথা। আমাকে ভিজিয়ে দিবি না তো?

না। বাবা, গাবদা পা মানে কী?

গাবদা পা মানে হলো গাধার পা।

আমার পা কি গাবদা?

তুই যদি গাধা হোস তাহলে তোর পা গাবদা। তোর হাত তাহলে হবে গাবহা। আর মুখ হবে গাবমু।

পৃথু শব্দ করে হেসে উঠল। বাবা এমন মজার মানুষ। বাবার মতো মানুষ পৃথিবীতে আর তৈরি হয় নি। কোনোদিন হবেও না।

মানুষটাকে চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিকমতো চেনা যাচ্ছে না। তার কী নাম, তার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছে কিছুই মনে পড়ছে না। শামসুদ্দিন অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর সামনে দাঁড়ানো মানুষটা রীতিমতো সুটেট বুটেট। সোনালি রঙের ব্লেজার, লাল টাই। মাথায় হালকা নীল রঙের ক্যাপ। সোনালি ফ্রেমের সানগ্লাসে চোখ ঢাকা।

মানুষটা শামসুদ্দিনের পা ছুঁয়ে সালাম করল। বিনীত ভঙ্গিতে হাসল। শামসুদ্দিন খুবই বিব্রত বোধ করছেন। সুটেট-বুটেট ধরনের কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে বলেই মনে পড়ছে না।

চাচাজি, আমাকে চিনেছেন?

না।

সানগ্লাসটা খুললে চিনবেন। সানগ্লাস পরা থাকলে মানুষকে চেনা যায় না। সিনেমার নায়ক-নায়িকারা এই জন্যে সানগ্লাস পরে থাকে। পাবলিক চিনতে পারে না।

লোকটা সানগ্লাস খুলে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, এখন চিনেছেন?

না।

সুটেট বুটেট মানুষটাকে খুবই আনন্দিত মনে হলো। যেন তাকে চিনতে না পারা খুবই আনন্দময় ঘটনা।

মাথার টুপিটা খুললে হয়তো চিনবেন। আমি জয়নাল। একসঙ্গে ভিসা পেয়ে গেলাম।

বলো কী! তুমি জয়নাল!

আপনি যে আমাকে চিনতে পারেন নি এতে আপনাকে কোনো দোষ দেয়া যায় না। আমি নিজেই আজ সকালে নিজেকে চিনতে পারি নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপটা মাথায় দিয়ে হতভম্ব। আয়নায় যাকে দেখা যাচ্ছে লোকটা কে? Who is him? চাচাজি ইংরেজি কি ঠিক আছে? Who is him.

Who is he হবে।

ভুলভাল যাই হোক ইংরেজি বলে যাচ্ছি। ভাষাটা সরগর হয়ে থাক।

আমেরিকানরা বুঝতে পারলেই হলো। আমার যুক্তিটা হচ্ছে চাচাজি, তোরা যখন আমাদের দেশে আসিস তখন তো বাংলা বলতে পারিস না— আমরা ভুলভাল যাই বলি তোদের ভাষাতেই বলি। ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক। জয়নাল বসো। তোমাকে দেখে ভালো লাগছে।

জয়নাল বসতে বসতে বলল, আমার ড্রেসটা কেমন হয়েছে চাচাজি?

খুবই ভালো।

জুতা বাদ দিয়ে কমপ্লিট ড্রেসে কত খরচ পড়েছে একটু আন্দাজ করেন তো? দেখি আপনার আন্দাজ।

এইসব বিষয়ে আমার একেবারেই আন্দাজ নাই। পাঁচ-ছয় হাজারের বেশি তো হবেই।

জয়নাল হাসি মুখে বলল, সর্বমোট ছয়শ একুশ টাকা খরচ পড়েছে। এর মধ্যে মার্কেটে যাতায়াতের আপ এন্ড ডাউন খরচ ধরা আছে। দু'কাপ চা খেয়েছি, একটা সিঙ্গাড়া খেয়েছি, সেই খরচও আছে। তিন টাকা দিয়ে একটা বেনসন সিগারেটও কিনেছি। সব মিলিয়ে ছয়শ একুশ। আমার কথা বিশ্বাস করা না করা এখন আপনার ব্যাপার।

কোত্থেকে কিনলে?

আপনাকে নিয়ে যাব। আজই নিয়ে যাব। বঙ্গবাজার থেকে কিনেছি। আপনার জন্যেও কাপড়-চোপড় দেখে এসেছি। আমেরিকার মতো দেশে যাচ্ছেন। নেংটি পরে তো যেতে পারবেন না। আপনি তো আর মহাত্মা গান্ধি না যে খালি গায়ে নেংটি পরে প্লেন থেকে নামবেন। Coming down from the plane with goat, without cloth, only নেংটি। চাচাজি নেংটি ইংরেজি কী?

নেংটির ইংরেজি হলো loin cloth।

জয়নাল বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি তো ইংরেজিতে মারাত্মক। নেংটির যে ইংরেজি আছে এইটাই আমি জানতাম না।

শামসুদ্দিন আন্তরিক গলায় বললেন, চা খাবে জয়নাল? ছেলেটার আনন্দ ঝলমল মুখ দেখতে তাঁর ভালো লাগছে।

জয়নাল বলল, চা অবশ্যই খাব। চলুন চা খেয়ে বের হয়ে পড়ি।

কোথায়?

কী বললাম একটু আগে? বঙ্গবাজার যাব। We go to bengali bazar।

আজই কিনতে হবে?

অবশ্যই। দু'টা ওভারকোট দেখে এসেছি। গায়ে দিয়ে বরফের চাং-এর উপর শুয়ে থাকলেও কিছু হবে না। উল্টা ওভারকোটের গরমে আপনি ঘামবেন।

গরমের চোটে সর্দি গর্মি হয়ে যেতে পারে। চাচাজি, আপনার কাছে সুই-সুতা আছে ? হলুদ সুতা লাগবে।

কেন বলো তো ?

ব্লেজারের একটা বোতাম খুলে গেছে। বোতাম লাগাতে হবে। ব্লেজার, টুপি, টাই সব আপনার এখানে রেখে যাব। কোনো অসুবিধা আছে ?

না, অসুবিধা নাই। আমার এখানে রাখবে কেন ?

আর বলবেন না— আমি যেখানে থাকি গতরাতে সেখানে চুরি হয়েছে। আমার স্যুটকেস নিয়ে চলে গেছে। আল্লাহ্‌পাকের অসীম রহমত পাসপোর্টটা স্যুটকেসে ছিল না। একবার ভেবেছিলাম স্যুটকেসে রাখি। যদি রাখতাম উপায়টা কী হতো বলেন দেখি ? আমেরিকান ভিসা লাগানো পাসপোর্ট বাজারে পাঁচ লাখ টাকায় বিকিকিনি হয়।

কী বলো তুমি ?

যা বলছি একশ ভাগ খাঁটি কথা বলছি। Hundred percent truth speaking। জাপানি ভিসা লাগানো পাসপোর্ট বিকিকিনি হয় ছয় লাখে। ওদেরটা এখন একটু বেশি দাম যাচ্ছে।

ভিসা লাগানো পাসপোর্ট দিয়ে কী করা হয় ?

পাসপোর্টের ছবি পাল্টে অন্য ছবি বসিয়ে দেয়া হয়। এমনভাবে কাজটা করা হয় যে কার বাপের সাধ্যি কিছু বুঝে। মনে করুন, আপনি আপনার পাসপোর্টটা বিক্রি করে দিলেন খোদেজা বেগমের কাছে। পাসপোর্টে আপনার ছবি পাল্টে লাগানো হবে খোদেজা বেগমের ছবি। এই পাসপোর্ট দেখিয়ে খোদেজা বেগম চলে যাবে আমেরিকায়। সে সেখানে এক সময় না এক সময় সিটিজেন হয়ে যাবে। তারপর সে তার আত্মীয়স্বজন একে একে আমেরিকায় টানতে শুরু করবে।

এরকম হয় নাকি ?

অবশ্যই হয়। হয় এবং হবে। আমি সবই জানি। গত নয় বছর তো এইটা নিয়েই আছি, জানব না কেন বলুন! চাচাজি, চা আর সুই-সুতা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন। বঙ্গবাজার চলে যাই। বঙ্গবাজার থেকে যাব ট্রাভেল এজেন্সিতে। আমার দূরসম্পর্কের এক মামা ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করেন। সবচে' কম দামে টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবেন। বুকিং দিয়ে রাখি। বুকিং দিতে টাকা পয়সা লাগবে না।

ওভারকোট পাওয়া গেল না। বিক্রি হয়ে গেছে। জয়নালের মেজাজ খুবই খারাপ। দু'টা গোলাপি রঙের মাফলার অবশ্যি কেনা হলো। তাতেও জয়নালের খুঁতখুঁতানি।

বুঝলেন চাচাজি, গোলাপি রঙের মাফলার কেনা ঠিক হয় নি। আমেরিকায় গোলাপি হলো মেয়েদের রঙ।

শামসুদ্দিন খুবই বিস্মিত হয়ে বললেন, মেয়েদের রঙ বলে আলাদা কিছু আছে না-কি ?

আমেরিকায় আছে। আমেরিকায় গোলাপি হলো মেয়েদের রঙ, নীল হলো ছেলেদের রঙ। বড়ই আজিব দেশ।

তাই তো দেখছি।

এখন আর কী দেখছেন— কেনেডি এয়ারপোর্টে পা দেবার পর মাথা ঘুরে ধরাস করে পড়ে যাবেন। প্রতি সেকেন্ডে সেখানে একটা করে বিমান আকাশে উড়ছে, একটা নামছে। কম্পিউটার সব কনট্রোল করছে বলে রক্ষা। নিউ ইয়র্কের রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা যে আমেরিকানদেরও মাথা আউলা হয়ে যায়। অন্য স্টেটের লোকজন পারতপক্ষে নিউ ইয়র্ক আসতে চায় না।

আমরা তো প্রথমে নিউ ইয়র্কেই যাচ্ছি।

অবশ্যই। আপনি মোটেই দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আছি। স্ট্যাচু অব লিবার্টি যা যা আছে আমিই সব দেখাব। স্ট্যাচু অব লিবার্টি দ্বীপের ভেতর। ফেরিতে করে যেতে হয়।

এত কিছু জানো কীভাবে ? তুমিও তো জীবনে প্রথম যাচ্ছ।

প্রথম গেলেও চাচাজি আমার সব মুখস্ত। চলুন এখন যাই ট্রাভেল এজেন্সিতে।

আজই যাবে ?

অবশ্যই আজ যাব। আগে ভাগে বুকিং দিয়ে না রাখলে পরে সমস্যায় পড়ে যাব। দেখা যাবে সব আছে, প্লেনের টিকিট নাই। চাচাজি, উজবেক এয়ারলাইন্স আপনার কাছে কেমন লাগে ?

উজবেক এয়ারলাইন্সের ব্যাপারটা কী ?

খুবই সস্তায় টিকিট দেয়। অবশ্যি তাদের সার্ভিস খুব খারাপ। মস্কোতে নিয়ে ফেলে রাখে। কোনো খোঁজ খবর করে না। তাতে আমাদের অসুবিধা কী ? ফাঁকতালে মস্কো দেখা হয়ে গেল। সুযোগ-সুবিধা পেলে ঘণ্টাটা দেখে এলাম।

ঘণ্টা দেখে এলে মানে কী ? কী ঘণ্টা ?

মস্কোর ঘণ্টা। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য।

মস্কোর ঘণ্টা দেখতে দেবে ?

অবশ্যই দেবে। পাসপোর্ট হোটেলে জমা রেখে বারঘণ্টার একটা পারমিট বের করে দু'জন চলে গেলাম। ভাষার সমস্যা হবে। ওরা ইংরেজির ইও জানে

না। ইশারায় কাজ সারতে হবে। যদি সত্যি সত্যি আমরা মস্কো হয়ে যাই তাহলে না হয় কাজ চালাবার মতো কয়েকটা রাশিয়ান শব্দ শিখে গেলাম।

যেমন ধরুন, তুমি কেমন আছ ? রাশিয়ান ভাষায় হবে— কাক্ দেলা। মস্কোর ঘণ্টা দেখব— রাশিয়ান ভাষায় হবে— খাচু স্মাতরিত মস্কোভ্সকি কোলাক্ল।

শামসুদ্দিন রীতিমতো বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি রাশিয়ান ভাষা জানো না-কি ?

জয়নাল আনন্দের হাসি হেসে বলল, যদি মস্কো হয়ে যেতে হয় এই ভেবে আগেই দু' একটা টুকটাক রাশিয়ান শিখে রেখেছিলাম। গুড মর্নিং-এর রাশিয়ান হলো— দোবরে উতরা।

শামসুদ্দিন বললেন তুমি আমাকে খুবই আশ্চর্য করলে।

জয়নাল বলল, উজবেক এয়ারলাইন্সে যাওয়াই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহলে রাশিয়ান এম্বেসিতে যাব। সেখানে রাশিয়ান জানা বাঙালি পাওয়া যাবে। এম্বেসি স্টাফ। ওদের কাছ থেকে ভালো মতো সুলুক-সন্ধান নিয়ে যাব। চাচাজি শুনুন, আজ দুপুরে আমার সঙ্গে খাবেন। খাওয়া ভালো হবে না। নিজে রেঁধে খাই। ডাল, ভাত, ডিমভাজি। তাতে অসুবিধা নেই— খাওয়াটা বড় কথা না। খেতে খেতে প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে হবে। আপনার কি কোনো সিরিয়াস অসুখ-বিসুখ আছে ?

কেন বলো তো ?

অসুখ-বিসুখ থাকলে আমেরিকায় ফ্রি অব কস্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। হেলথ ইনস্যুরেন্স না থাকলে ঐ দেশে চিকিৎসা হয় না তা ঠিক, তবে অন্য সূক্ষ্ম ব্যবস্থা আছে। ফেডারেল গভর্নমেন্টের হাসপাতাল আপনার চিকিৎসা করতে বাধ্য। আপনাকে নিয়ে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে উপস্থিত হতে হবে। চিকিৎসা না করে যাবি কোথায় ?

শামসুদ্দিন বিস্মিত গলায় বললেন, আমেরিকার সব কিছুই দেখি তুমি জানো।

জয়নাল আনন্দের হাসি হেসে বলল, নয় বছর ধরে লেগে আছি। জানব না কেন ? আমেরিকায় চোখ বন্ধ করে ছেড়ে দিলেও আমার কোনো সমস্যা হবে না।

দুপুরে জয়নাল রান্না করল। কেরোসিনের চুলায় রান্না। শামসুদ্দিন চৌকিতে পা তুলে বসে জয়নালের রান্না দেখলেন। জয়নাল বলেছিল ডাল, ভাত, ডিম ভাজা।

দেখা গেল রান্নার আয়োজন ব্যাপক। বেগুন ভাজা আছে। গরুর মাংসের কিমার সঙ্গে বুটের ডাল দিয়ে কুচকুচে কালো রঙের অদ্ভুত তরকারি। ডিম ভাজা হলো না, সিদ্ধ ডিম কচলে ভর্তা বানানো হলো— তার রঙও কালো।

জয়নালের থাকার জায়গাটা শামসুদ্দিনের পছন্দ হলো। বাড়ির গ্যারেজের উপর লম্বাটে ঘর। দু'টা চৌকি এবং টেবিল পাতার পরেও খানিকটা জায়গা আছে। সবই বেশ গোছানো। ঘরে জানালা আছে। জানালা দিয়ে সজনে গাছের ডাল দেখা যায়। শামসুদ্দিন বললেন, তুমি একা থাক না?

জয়নাল বলল, এখন একা থাকি। আগে আমার সঙ্গে সিদ্দিক থাকত। সে বিয়ে করে জুরাইনে তার শ্বশুরবাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে আমার এখানে থাকতে আসে। বিছানা রেডি করা থাকে বলে অসুবিধা হয় না। ওর কাছে এক্সট্রা চাবি আছে।

বাথরুমের ব্যবস্থা কী?

নিচে সার্ভেন্টস টয়লেট আছে। চাচাজি বাথরুমে যাবেন?

না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

আমেরিকায় আপনি তো বেড়াতেই যাচ্ছেন— না-কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে?

কোনো উদ্দেশ্য নেই। বেড়াতেই যাচ্ছি।

তাহলে প্রথম কিছুদিন আপনাকে নিয়ে বেড়াব। আটলান্টিক সিটিতে নিয়ে যাব। ক্যাসিনো আছে। স্লট মেশিনে অল্প পয়সায় জুয়া খেলবেন।

জুয়া খেলার দরকার কী?

কোনো দরকার নেই। অভিজ্ঞতার জন্যে খেলা। আটলান্টিক সিটি থেকে আপনাকে নিয়ে যাব লাস ভেগাস। মরুভূমির ভেতর কী জিনিস বানিয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। লাস ভেগাসে কিছু শো হয়। সেগুলিও দেখার মতো। এখন লাস ভেগাসের সির্জাস প্লেসে ডেভিড কপারফিল্ড যাদু দেখাচ্ছে। সিজার্স প্লেসের সঙ্গে ডেভিড কপারফিল্ডের এক বছরের চুক্তি হয়েছে। এক বছর ডেভিড কপারফিল্ডকে নিয়মিত যাদু দেখাতে হবে। ডেভিড কপারফিল্ডের নাম শুনেছেন তো?

না।

বলেন কী! মারাত্মক মেজিশিয়ান। আস্ত এরোপ্লেন ভ্যানিশ করে দিয়েছিল। আপনাকে ডেভিড কপারফিল্ডের যাদু ইনশাল্লাহ দেখাব। ত্রিশ ডলার করে টিকিট। সেখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাব গ্রান্ড কেনিয়ন দেখাতে। গ্রান্ড কেনিয়নে গাধা ভাড়া পাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে গাধার পিঠে চড়ে গ্রান্ড কেনিয়নে

নামতে পারেন। ঘণ্টা হিসেবে গাধা ভাড়া করতে হবে। ঘন্টায় বিশ ডলার।

তুমি এমনভাবে বলছ যেন আগেও কয়েকবার লাস ভেগাস গিয়েছ।

না গেলেও সবই জানি। আপনার যে-সব জায়গায় যাবার ইচ্ছা তার দু'একটার নাম বলুন তো।

নায়াগ্রা জলপ্রপাতটা দেখার ইচ্ছা ছিল।

কোনো ব্যাপারই না। নিউইর্য়ক থেকে এমট্রেক নিয়ে চলে যাব। তিন থেকে সাড়ে তিনঘণ্টা লাগবে। ভাড়াও সস্তা। এক কাজে দুই কাজ হবে— আমেরিকান ট্রেনও দেখা যাবে। এমট্রেক হলো বিশ্বের এক নম্বর ট্রেন সার্ভিস। আরাম আয়াশের রাজকীয় ব্যবস্থা। ট্রেনে কাচের একটা ঘর আছে। এই ঘরে হাতে বিয়ারের ক্যান নিয়ে বসবেন। চারপাশের সিন সিনারি দেখতে দেখতে যাবেন।

বিয়ারের ক্যান হাতে বসব ?

কোনো অসুবিধা নেই। সেই দেশে বিয়ার পানির মতো খায়। দামও পানির মতো সস্তা। এক বোতল পানি কিনতে এক ডলার লাগে। এক ক্যান বিয়ার কিনতে লাগে পঞ্চাশ সেন্ট। চাচাজি, বিয়ার কখনো খেয়েছেন ?

না।

আমিও কখনো খাই নাই। ঠিক আছে দু'জনে মিলে একদিন টেস্ট করব। কী বলেন ? পরে না হয় তওবা করে ফেলব। কী বলেন ?

ঠিক আছে।

ষাট ডলারে গ্রে হাউন্ডের টিকিট কাটলে পুরা আমেরিকা দেখে ফেলতে পারতাম।

গ্রে হাউন্ড ব্যাপারটা কী ?

গ্রে হাউন্ড হলো কুকুরের নাম। আমাদের দেশের সরাইলের কুকুরের মতো কুকুর। এই কুকুরের নামে আমেরিকানদের ইন্টারস্টেট বাস সার্ভিস আছে। আমাদের দেশের বাস আর ঐ দেশের বাসের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। বাসে চড়লে মনে হবে প্লেনের ফার্স্টক্লাসে বসে আছেন। চাচাজি আসেন, রান্না শেষ। খেয়ে নেই।

আমেরিকার খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে তো তুমি কিছু বললে না ?

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। ম্যাকডোনাল্ড আছে। ফাস্ট ফুড। দামে সস্তা। অতি সুস্বাদু। পুরো আমেরিকা এর উপর বেঁচে আছে। তারপর ধরেন পিজা। পিজা হাটের পিজা— একবার খেলে মুখে আর অন্য কিছু রুচবে না। তারপর আছে ক্যান্টাকি ফ্রায়েড চিকেন, কর্নেল সাহেবের রেসিপি। আমেরিকার প্রধান খাদ্য সম্পর্কে তো কিছু বললামই না।

প্রধান খাদ্য কী ?

প্রধান খাদ্য হলো— স্টেক। একটা স্টেক খেলে মনে হবে বেহেশতি খানা খাচ্ছেন।

ভাত তো খেতে হবে। ভাত ছাড়া অন্য যে-কোনো খাবার আমার কাছে নাশতার মতো লাগে।

নিজেকে বদলাতে হবে চাচাজি। যখন যে দেশে যাবেন তখন সেই দেশের খানা খাবেন। তারপরেও যদি খুব অসুবিধা হয়— আমি তো আছিই। চারটা চাল ফুটিয়ে দেব।

চাল পাওয়া যায় ?

আরে কী বলেন, চাল পাওয়া যাবে না কেন ? মোড়ে মোড়ে ইন্ডিয়ান আর বাংলাদেশী গ্রসারি সপ। চেপা শুঁটকি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

চেপা শুঁটকি আমার খুবই পছন্দের খাবার।

চাচাজি আমেরিকায় কি আপনি চেপা শুঁটকি খাবার জন্যে যাচ্ছেন ? আপনাকে আমেরিকায় নিয়ে দেখি সিরিয়াস বিপদে পড়ব। আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলেই ভালো ছিল।

দুপুরে শামসুদ্দিন খুব আরাম করে খেলেন। সারাদিন হাঁটাহাঁটি করায় পেটে ক্ষুধা ছিল— জয়নালের রান্নাও অসাধারণ। কুচকুচে কালো রঙের ডিমের ভর্তার এত স্বাদ তিনি জানতেন না। ডাল-কিমাও অপূর্ব লাগল। তাঁর মনে হলো তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত কালো রঙের ডাল-কিমা দিয়ে ভাত খেতে পারবেন।

খাওয়ার পর কাঁচা সুপারি দেয়া পান। জয়নাল বলল, আমেরিকায় পান পাওয়া যায় না। পান যা খাবার দেশেই খেয়ে নেন। শুকনা সুপারি দিয়ে খাবেন না। কাঁচা সুপারি— হার্টের জন্যে ভালো।

শামসুদ্দিন পান খান না। আজ আগ্রহ নিয়ে পান চিবাতে লাগলেন। জয়নাল বলল, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন তো চাচাজি। দুপুরে খাবার পর আধ ঘণ্টার ঘুমকে বলে সিয়াস্তা। স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ভালো। শরীর ফ্রেস হয়ে যায়। আমি আধ ঘণ্টার জন্যে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে ?

গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশন। দোয়া রাখবেন যেন সাকসেস পাই। কী মিশন ফিরে এসে আপনাকে বলব। আপনি আরামের ঘুম দেন। মশারি খাটিয়ে দেব ?

দিনের বেলা মশারি খাটাবে কেন ?

বাংলাদেশে চাচাজি দিনের বেলা মশারি খাটানোই জরুরি। রাতে মশা কামড়ালে কিছু যায় আসে না। দিনের মশার কামড় মানে ডেঙ্গু। এখন খোদা

না চায় যদি ডেঙ্গু হয় আমাদের আমেরিকা যাবার টাইমিং-এ গণ্ডগোল হয়ে যাবে। আমাদেরকে প্রতিটি স্টেপ নিতে হবে সাবধানে। রাস্তার পাশের ফুচকা চটপটি খাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। বাসি কোনো খাবার দেখলে দশ হাত দূরে থাকবেন। ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে এমন কোনো রোগী দেখতে যাবেন না।

কঠিন সব নিয়ম কানুন।

অবশ্যই কঠিন নিয়ম। হজে যাবার আগে হাজিদের কী করে দেখেন না ? হাজি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আলাদা করে রাখে। আমেরিকা যাত্রীদেরও এরকম আলাদা করে রাখা দরকার। সিগারেট খাবেন চাচাজি ?

খেতে পারি একটা সিগারেট।

জয়নাল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনার সামনে সিগারেট টানছি, আমার বেয়াদবি নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।

দিলাম ক্ষমা করে। জয়নাল, তোমার দেশের বাড়ি কোথায় ?

ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহ তো বিরাট এলাকা। ময়মনসিংহের কোথায় ?

ময়মনসিংহের চোখের কোনায়। নেত্রকোনায়।

দেশের বাড়িতে কে আছে ?

কেউ নাই। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক বোন আছে। খুলনায়। তার ঠিকানাও জানি না।

বোনের ঠিকানা জানো না কেন ?

দশ বছর আগে রাগ করে বোনের বাসা থেকে চলে এসেছিলাম, তারপর আর যোগাযোগ করি নাই। বোন-জামাই এর রিস্টওয়াচ পাওয়া যাচ্ছিল না। সে মনে করল আমি চুরি করে বাজারে বেঁচে দিয়েছি। কথা নাই বার্তা নাই আমার চুল ধরে থাপ্পর।

বলো কী!

মারধর সে আগেও করেছে তাতে মন খারাপ হয় নি। মনে কষ্ট পেয়েছিলাম বোনের কারণে। আমার বোন আমাকে আড়ালে নিয়ে হাতে একশ টাকা দিয়ে বলেছিল— ঘড়িটা ফিরত দিয়ে দে জয়নাল। তোর দুলাভাই-র শখের ঘড়ি। বুঝলেন চাচাজি, মনটা আমার এতই খারাপ হলো সেই একশ টাকা নিয়ে বোনের বাড়ি থেকে চলে এলাম আর ফেরত যাই নাই।

ভালো করেছ।

খুবই কষ্টের জীবন গিয়েছে। এখন আল্লাহ্‌পাকের দয়া হয়েছে। তিনি মুখ তুলে তাকিয়েছেন, হাতে কেচি সাপ্লাই করেছেন। আর অসুবিধা নাই।

কেঁচি সাপ্লাই করেছেন— মানে বুঝলাম না।

আল্লাহপাক তাঁর পছন্দের মানুষদের হাতে একটা করে ধারালো কেঁচি সাপ্লাই করেন। তাঁর পছন্দের মানুষরা সেই কেঁচি দিয়ে তার সামনের সমগ্র বাধা বিপত্তি কচকচ করে কাটতে কাটতে এগোতে থাকে। আমার হাতে এতদিন কোনো কেঁচি ছিল না, এখন আছে। আমেরিকান ভিসাটা হলো সেই কেঁচি।

শামসুদ্দিন হেসে ফেললেন। জয়নাল বলল, আপনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে টাইট হয়ে ঘুম দেন। আমি কাজ সেরে এসে আপনাকে ডেকে তুলব।

আচ্ছা যাও।

কোথায় যাচ্ছি আপনাকে বলেই যাই। শেষ পর্যন্ত তো আপনাকে বলতেই হবে। আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই— আপনাকে আমার উকিল বাপ হতে হবে।

বিয়ের কোনো ব্যাপার ?

ঠিক ধরেছেন। মেয়ের নাম ইতি। খুবই সুন্দরী মেয়ে। ফার্স্ট ইয়ার ইন্টারে পড়ে। আমার এক বন্ধু আছে সালাম নাম। তার খালাতো বোন। সালামের মাধ্যমে পরিচয়।

ইতিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ ?

আমার দিক থেকে খুবই ইচ্ছা আছে। ইতির ইচ্ছা আছে কিনা জানি না। চ্যাং ব্যাং টাইপ মেয়ে তো, এদের আসল ভাব বোঝা যায় না।

চ্যাং ব্যাঙ টাইপ মেয়ে মানে ?

এরা সব ছেলের সঙ্গে ভাব করে। যে ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয় তার সঙ্গেই এমন ভাব করে যেন গলে যাচ্ছে। কিন্তু বিয়ে করার সময় বাবা মা যাকে নিয়ে আসে তাকে বিয়ে করে। এখন অবশ্যি আমার আশা আছে— আমেরিকান ভিসা হয়ে গেছে। গেট পাস পেয়ে গেছি। ওরা রাজি হলে তুমি কি ইতিকে বিয়ে করে যাবে ?

হুঁ। চাচাজি আমার ধারণা বিয়ে হয়েও যাবে। দুর্ভাগ্য যখন আসে একের পর এক আসতে থাকে। সৌভাগ্যের বেলাতেও তাই, সৌভাগ্য আসতে শুরু করলে একের পর এক আসতেই থাকে। নেন, আরেকটা সিগারেট নেন। টান দিয়ে শুয়ে পড়ুন।

জয়নাল মশারি খাটিয়ে দিল। শামসুদ্দিন দিনের বেলাতে মশারির ভেতর ঢুকে গেলেন। ঘুমের জন্যে দিনটা ভালো। আকাশে মেঘ ছিল, দেখতে দেখতে আঁধার করে বৃষ্টি নামল। টিনের চালে ঝুম ঝুম শব্দ। বাতাসের ঝাপ্টায় জানালা দিয়ে সজনে গাছের ডাল ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। শীত শীত লাগছে। চাদর গায়ে

জড়িয়ে শামসুদ্দিন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ঘুম ভাঙল বিকাল পাঁচটায়, তখনো জয়নাল ফিরে নি। আধ ঘণ্টার জন্যে গিয়ে এতক্ষণ দেরি করার কোনো কারণ নেই।

শামসুদ্দিন বিছানা থেকে নামলেন। কেরোসিনের চুলা জ্বালিয়ে নিজেই চা বানিয়ে খেলেন। পুরনো ম্যাগাজিন পড়লেন। রাত আটটা বেজে গেল, জয়নাল ফিরল না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। ঘরে তালা লাগিয়ে চলে যেতে পারেন। তালার সঙ্গে চিঠি লিখে যাবেন—

জয়নাল,

তোমার দেরি দেখে চলে গেলাম।

তোমার ঘরের চাবি আমার কাছে।

ইতি শামসুদ্দিন

কিংবা চাবিটা বাড়িওয়ালার কাছেও রেখে যেতে পারেন।

বৃষ্টি কমে গিয়েছিল। রাত আটটার পর আবার বাড়ল। রীতিমতো ঝড়। ঘর-বাড়ি কাঁপছে। কোনো একটা ফুটো দিয়ে ঘরে পানি ঢুকছে। মেঝেতে চার আঙুল পানি জমে গেছে। রাত সাড়ে ন'টার দিকে ইলেকট্রিসিটিও চলে গেল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। দেয়াশলাইও জ্বালানো যাচ্ছে না। ম্যাচ বাক্স বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে।

রাত এগারোটার দিকে জয়নালের ঘরে তালা লাগিয়ে শামসুদ্দিন নিজের বাসার দিকে রওনা হলেন। চিঠি লিখে আসা হলো না। কীভাবে লিখবেন? কলম কাগজ অন্ধকারে কোথায় খুঁজবেন। শামসুদ্দিনের দুশ্চিন্তার কোনো সীমা রইল না। জয়নাল ছেলেটা কোনো বিপদে পড়ে নি তো? কোনো এক্সিডেন্ট? বিপদে তো সে অবশ্যই পড়েছে। বিপদটা কী রকম?

রাত এমন কিছু না। মাত্র এগারোটা। অথচ পুরো শহর ফাঁকা। রাস্তায় নদীর মতো চলমান পানি। ম্যানহোলে পানি পড়ছে— শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বান ডাকছে। খালি রিকশা অনেক আছে, কোনোটাই যেতে রাজি না।, একজন পঁচিশ টাকা ভাড়ায় যেতে রাজি হলো। শামসুদ্দিন রাস্তার ময়লা পানিতে মাখামাখি হয়ে যখন রিকশাওয়ালার কাছাকাছি পৌছলেন তখন সে বলল— না যাব না। শামসুদ্দিন শীতে কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে বাড়ি ফিরলেন।

ঘরে কি টেলিভিশন চলছে ?

টেলিভিশনের শব্দই তো আসছে। কার্টুন চ্যানেল। ঝাঁ ঝুমঝুম ঝাঁ মিউজিক। পৃথুর হাসি শোনা যাচ্ছে। এই ছেলেটার হাসি খুব অদ্ভুত। খিলখিল করে হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে একেবারে চুপচাপ। একশ কিলোমিটারের গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষে থেমে গেল।

শামসুদ্দিনের মনে হলো তিনি স্বপ্ন দেখছেন। ঘরে টিভি থাকার কথা না। রফিক টিভি বিক্রি করে দিয়েছে। টিভি থাকলেও রাহেলা পৃথুকে সকালবেলা টিভি দেখতে দেবে না। রাহেলার নিয়ম কানুন খুব কড়া।

তিনি পাশ ফিরলেন। আসলেই স্বপ্ন দেখছেন কি-না এটা জানার জন্যে পাশ ফেরা। স্বপ্নে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে, পাশ ফিরতে পারে না। সহজেই তিনি পাশ ফিরলেন। তিনি জেগে আছেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল। তাঁর কি শরীর খারাপ করেছে ? মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা। চোখ মেলতে পারছেন না। কেউ যেন সুপার গ্লু দিয়ে চোখের পাতা আটকে দিয়েছে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে অথচ পানির তৃষ্ণা নেই। অসুস্থ মানুষের শরীর পানির জন্যে খাঁ খাঁ করে অথচ তার তৃষ্ণা হয় না।

ভাইজান, শরীরের অবস্থা এখন কী ?

শামসুদ্দিন চোখ মেললেন। ধ্বক করে কিছু হলুদ আলো চিড়বিড়িয়ে চোখের ভেতর দিয়ে মগজে ঢুকে গেল। রফিক বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে খাটে বসতে বসতে বলল— কাল রাতে আপনাকে দেখে ভয়ই পেয়েছিলাম। চোখ টকটকে লাল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত হাঁচি দিয়ে যাচ্ছেন। হাঁচির চোটে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। আপনার অবস্থা দেখে রাহেলা শুরু করল কান্না। এখন আছেন কেমন ?

ভালো।

রফিক কপালে হাত দিয়ে বলল, জ্বর এখন সামান্যই আছে। নাশতা খাবেন ? ক্ষিধা পেয়েছে ?

না।

একগ্লাস লেবুর শরবত বানিয়ে নিয়ে আসি। জ্বরের রেমিশন হলে শরীরে হাই ডোজের ভিটামিন সি পড়লে শরীর 'ঝন' করে ঠিক হয়ে যায়।

শরবত খাব না।

তাহলে মসলা চা খান। আদা-লং আর এলাচ দিয়ে খাঁটি নেপালি মসলা চা। রাহেলা ঘরে নেই। চা আমাকেই বানাতে হবে।

রাহেলা কোথায় ?

রফিক বিরক্ত মুখ করে বলল, জানি না কোথায়। রাতে মাইল্ড একটা ঝগড়া হয়েছে। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি সে নাই। কাজের মেয়েটাও নাই। দু'জন না-কি এক সঙ্গে বের হয়েছে।

কোথায় গেছে কাউকে বলে যায় নি ?

পৃথুকে বলে গেছে। আমি পৃথুকে জিজ্ঞেস করলাম, কী বলে গেছে ? সে বলল, তার মনে নাই। গাধা টাইপ ছেলে হলে যা হয়। যাই হোক ভাইজান আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। সে তার কোনো বান্ধবীর বাসায় ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। যাবে আর কোথায় ? যাবার কি জায়গা আছে না-কি।

শামসুদ্দিন বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, শরীরের এই অবস্থায় রাগারাগি করে ঘর থেকে বের হওয়া ঠিক না।

রফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ঠিক না তো অবশ্যই। তাকে কে বোঝাবে ? কাল রাতে সে ডিসিসান নিয়েছে কাজের মেয়ে ছাড়িয়ে দেবে। ভালো একটা কাজের মেয়ে পাওয়া আর সোনার খনি পাওয়া সেম জিনিস। ক্রিকেট খেলায় কিছু কিছু ব্যাটসম্যান যেমন সেট হয়ে যায়, কাজের মেয়েও সেট হয়ে যায়। সামান্য দোষত্রুটি থাকলেও সেট হওয়া কাজের মেয়ে বিদায় করতে নেই।

শামসুদ্দিন কিছু বললেন না।

রফিক বলল, ভাইজান সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ কি খারাপ লাগছে ? যদি খারাপ না লাগে তাহলে বুঝবেন অসুখ সেরে গেছে। অসুখটা সেরেছে কি-না এটা জানার জন্যেই আপনার মুখের কাছে ধোঁয়া ছাড়ছি।

গন্ধটা তেমন খারাপ লাগছে না।

তাহলে উঠে হাতমুখ ধোন। আমি হোটেল থেকে ডালপুরি নিয়ে আসি। কিংবা পৃথুর সঙ্গে টিভি দেখতে পারেন।

টিভি কিনেছ না-কি ?

টিভি কিনব কী জন্যে ? নষ্ট টিভি সারাতে দিয়েছিলাম। সারিয়ে দিয়ে গেছে।

রাহেলা বলেছিল টিভি বিক্রি করে দিয়েছ।

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, টিভি বিক্রি করে দেব কী জন্যে? ভাইজান শুনুন, আপনার বোনের বেশিরভাগ কথাই বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করলে ধরা খাবেন। সে এমনভাবে মিথ্যা কথা বলে যে শুনলে মনে হবে সত্যের বাবা। অবশ্যই এটা একটা অসুখ। এই অসুখের চিকিৎসা আছে কি-না জানি না। জ্বর হলে ডাক্তারকে গিয়ে বলতে পারি— জ্বর হয়েছে। ট্যাবলেট দেন। এখন ডাক্তারকে গিয়ে কী বলব, আমার স্ত্রী শুধু মিথ্যা কথা বলে, ট্যাবলেট দেন?

শামসুদ্দিন হেসে ফেললেন। রফিকের কথা শুনে এত ভালো লাগছে! রাহেলা তার স্বামী সম্পর্কে যা বলেছে সবই যে বানিয়ে বলেছে তা বোঝা যাচ্ছে। এটা আনন্দ এবং স্বস্তির বিষয়। তাঁর মনে হলো শরীরে যতটুকু অবসাদ আছে সবটাই কেটে গেছে।

ভাইজান, কাল বৃষ্টিতে ভিজে এত রাতে কোত্থেকে ফিরেছেন? রাতে আপনার যে অবস্থা ছিল কিছু জিজ্ঞেস করি নি।

জয়নালের বাসায় গিয়েছিলাম।

জয়নালটা কে?

সেও আমার সঙ্গে ভিসা পেয়েছে। দু'জন এক সঙ্গে আমেরিকা যাব। অত্যন্ত ভালো ছেলে। আমাকে তার বাসায় রেখে আধঘন্টার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছিল। তারপর আর ফিরে না। অপেক্ষা করতে করতে দেরি হয়ে গেল। বাসায় আর কেউ নেই, আমি একা।

শেষে ফিরেছে তো?

না। তার টেবিলের উপর তালাচাবি ছিল। ঘরে তালা দিয়ে আমি চাবি নিয়ে চলে এসেছি। চিঠি লিখে এসেছি আমার কাছ থেকে যেন চাবি নিয়ে যায়।

রফিক বিরক্ত গলায় বলল, ভাইজান আপনি ঐ ছেলের কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকবেন। বোঝাই যাচ্ছে ধান্দাবাজ ছেলে। আপনার সঙ্গে খুব খাতির জমাবে। এক সময় টাকা ধার করবে। এই টাইপ ছেলে আমি চিনি।

ছেলেটা সে-রকম না। কোনো বিপদে নিশ্চয়ই পড়েছে।

কোনো বিপদে পড়ে নি। কোনো একটা চাল চেলেছে। চাল না চাললে খালি বাসায় আপনাকে বসিয়ে রেখে আধঘন্টার কথা বলে বাইরে যায়? আপনি সোজা-সরল মানুষ। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করেন। ধান্দাবাজ লোকজন আপনার মতো মানুষ খোঁজে। তারপর সুযোগ বুঝে ঘাড়ে চেপে বসে। একেবারে সিন্দাবাদের ভূত। ঘাড় থেকে নামানোই যাবে না।

রফিক হোটেলে নাস্তা কিনতে গেল। শামসুদ্দিন পৃথুর পাশে এসে বসলেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। মাথা সোজা করে বেশিক্ষণ বসে থাকা যাবে বলে মনে হয় না। কষ্ট করে হলেও কিছুক্ষণ পৃথুর সঙ্গে থাকা। মামাকে পাশে বসতে দেখে পৃথু আনন্দে অভিভূত গলায় বলল, মামা দেখ, বাবা টিভি এনেছে। রাতে এনেছে।

শামসুদ্দিন বললেন, খুব খুশি ?

পৃথু মামার গায়ে এলিয়ে পড়ে বলল, হুঁ। তুমি খুশি মামা ?

হুঁ। আমিও খুশি।

দু'জনের মধ্যে কে বেশি খুশি মামা ? তুমি না আমি ?

মনে হচ্ছে আমি বেশি খুশি।

পৃথু চোখ মুছতে মুছতে বলল, হয় নি। আমি খুশি। শামসুদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, তুই কি খুশিতেই কাঁদছিস না-কি ?

পৃথু বলল, জানি না।

শামসুদ্দিন বাঁ হাতে পৃথুকে জড়িয়ে ধরলেন। পৃথু গাঢ় গলায় বলল, বাবা বলেছে মা না আসা পর্যন্ত আমি টিভি দেখতে পারব। আজ আমাকে স্কুলেও যেতে হবে না।

তাহলে তো তোর আজ ঈদ!

হুঁ।

তোর মা যদি সারাদিন না ফেরে তাহলে কী করবি ? সারাদিন টিভি দেখবি ?

হুঁ।

আমেরিকা থেকে তোর জন্যে কী আনব ?

বন্দুক।

শুধু বন্দুক, আর কিছু না ?

না।

বড় হয়ে তুই কী হবি রে পৃথু ?

কিছু হবো না মামা।

ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্টিস্ট কিছুই হবি না ?

না।

আমার মতো ঝিম ধরে ঘরে বসে থাকবি ?

হুঁ।

আচ্ছা পৃথু শোন, তোর বাবা আর মা এই দু'জনের মধ্যে তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস?

তোমাকে।

আমাকে ভালোবাসিস কেন?

জানি না। তুমি আমেরিকা চলে গেলে আমার কী রকম দুঃখ হবে জানো মামা?

কী রকম দুঃখ হবে?

টিভি না থাকলে যে-রকম দুঃখ হয় সে-রকম।

শামসুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই তো দেখি ভালোই কথা বলা শিখে গেছিস। ফুটুর ফুটুর করে বড় হচ্ছিস তো এই জন্য বোঝা যায় না।

পৃথু বলল, মামা তুমি আমেরিকায় কেন যাচ্ছ? বেড়াতে?

শামসুদ্দিন থমকে গেলেন। তিনি আমেরিকায় বেড়াতে যাচ্ছেন না। একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সেই কথাটা কি পৃথুকে বলা যায়? হয়তো বলা যায়— শিশুদের সঙ্গে সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়। ভূতপ্রেতের গল্প তারা যে আগ্রহ নিয়ে শোনে, সিরিয়াস বিষয়ে আলোচনাও তারা সে-রকম আগ্রহ নিয়েই শোনে। সিরিয়াস বিষয় সম্পর্কে মতামতও দেয়। সেই মতামত অগ্রাহ্য করার মতো না।

একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

ও আচ্ছা!

শামসুদ্দিন বললেন, একজন মানুষ অনেক বছর আগে আমার মনে খুব কষ্ট দিয়েছিল। কেন সে কষ্ট দিয়েছিল এটা তাকে জিজ্ঞেস করব।

এখনো মনে কষ্ট আছে?

আছে।

ও আচ্ছা!

পৃথু টিভি দেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার পছন্দের কার্টুন শো শুরু হয়েছে। ফ্লিনস্টোন পরিবার এসে গেছে। শামসুদ্দিনও আগ্রহ নিয়েই কার্টুন দেখছেন। পৃথুর সঙ্গে পৃথুর পছন্দের অনুষ্ঠানগুলো তিনি সব সময় দেখেন। পৃথু তখন একই সঙ্গে কার্টুন দেখে এবং তার মামাকে দেখে। হাসির জায়গাগুলোতে তার মামা যদি না হাসে তখন সে মামার পেটে খোঁচা দেয়। শামসুদ্দিন হাসতে শুরু করলে সে গলা মিলিয়ে হাসে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

টিভিতে ফ্লিনস্টোন পরিবার পানিতে পড়ে গেছে। পরিবারের কর্তা সাঁতার কীভাবে দিতে হয় ভুলে গেছেন। তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাঁতার শেখানো হচ্ছে। খুবই হাস্যকর পরিস্থিতি। শামসুদ্দিন হাসছেন না। পৃথুর খোঁচা খেয়ে হাসতে শুরু করলেন। পৃথুও হাসছে। হাসতে হাসতে পৃথুর চোখে পানি এসে গেল। সে চোখের পানি মুছে বলল, যে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছিল তার নাম কী?

শামসুদ্দিন হকচকিয়ে গেলেন। পৃথু কার্টুন ঠিকই দেখছে কিন্তু মাথায় মামার কষ্ট পাওয়ার ব্যাপারটা আছে। তিনি ইতস্তত করে বললেন, তার নাম বীথি।

পৃথু বলল, ও আচ্ছা! কার্টুনে আরো মজার দৃশ্য শুরু হয়েছে। ফ্লিনস্টোন অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সাঁতার শিখে ফেলেছে। সমস্যা একটাই— সাঁতারের টেকনিকে গণ্ডগোল হচ্ছে। সে সাঁতরে সামনে যেতে চায় কিন্তু চলে যায় পেছনে। এ দিকে পেছন থেকে ভয়ঙ্কর হাঙ্গর মাছ দেখা যাচ্ছে। ফ্লিনস্টোন সাঁতরে হাঙর থেকে যতই দূরে যেতে চায় ততই কাছে চলে আসে। পৃথু তার মামার পেটে শক্ত খোঁচা দিল— শামসুদ্দিন হাসতে শুরু করলেন।

ডালপুরি নাশতা শামসুদ্দিন খেতে পারলেন না। তেল পোড়ার গন্ধে তার বমি আসতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীরে ক্লান্তিময় আলস্য। তিনি চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলেন। তিনি বুঝতে পারছেন— জ্বর আসতে শুরু করেছে। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রবল বেগেই আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাথা তোলার শক্তিও থাকবে না। জয়নালের খোঁজে তার একবার যাওয়া উচিত। ছেলেটা কি এখনো ফিরে নি? তার কি সমস্যা হয়েছে? কোনো একটা বিপদে যে সে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। বিপদটা কোন ধরনের? একসিডেন্ট করে হাত পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে নাই তো?

দুপুরে পৃথু এসে তাঁর পাশে কিছুক্ষণ বসে রইল। কপালে হাত দিয়ে বলল, মামা তোমার জ্বর কি খুব বেশি নাকি? শামসুদ্দিন বললেন, হুঁ।

মাথাব্যথা করছে?

হুঁ।

শুয়ে শুয়ে টিভি দেখবে মামা? শুয়ে শুয়ে টিভি দেখলে মাথাব্যথা কমে যায়।

না, টিভি দেখব না। তুই যা, টিভি দেখতে থাক। আমার পাশে বসে থাকতে হবে না।

পৃথু ক্ষীণ গলায় বলল, মামা, দুপুরে আমরা ভাত খাব না?

আমি খাব না। তুই খাবি।

ভাত কে রাঁধবে ? বাবা চলে গেছে।

দুপুরে ভাত খাবার আগে তোর বাবা ফিরে এসে ভাত রাঁধবে কিংবা হোটেল থেকে ভাত আনবে।

মা আর কোনোদিন বাসায় আসবে না ?

আসবে না কেন, অবশ্যই আসবে। রাগ কমলেই আসবে। তবে রাগটা দেরিতে পড়াই ভালো। তুই বেশিক্ষণ টিভি দেখতে পাবি।

হুঁ। মামা, আমি কি তোমার চুল টেনে দেব ?

কোনো দরকার নেই। তুই যা, টিভি দেখতে থাক।

পানি খাবে ? পানি এনে দিই। পানি আনতে হবে না।

পৃথু চলে গেছে। শামসুদ্দিন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। জ্বরের ঘোরে তার হাত-পা কাঁপছে। টিভির শব্দ খুব কানে লাগছে। পৃথুকে বললেই সে শব্দ বন্ধ করে শুধু ছবি দেখবে। কোনো আপত্তি করবে না, মন খারাপও করবে না। কিন্তু তাকে বলতে ইচ্ছা করছে না। আহা, বাচ্চা মানুষ আগ্রহ করে দেখছে, দেখুক। শীতে শরীর কাঁপছে। একটা কম্বল গায়ে দিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। ওয়ারড্রোবে কম্বল আছে। তিনি যে নেমে কম্বল আনবেন সেই শক্তিও নেই। মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় নি তো ? শামসুদ্দিন গভীর ঘোরে তলিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘুম ভাঙল পানির শব্দে। কেউ পানির কল ছেড়ে দিয়েছে। প্রবল বেগে পানির কল থেকে পানি বের হচ্ছে। পানি পড়ছে তাঁর মাথাতেই। পানি ঢালছে রাহেলা। সে ঝুঁকে এসে বলল, ভাইজান, এখন কি একটু ভালো লাগছে ?

তিনি বললেন, হুঁ।

রাহেলা বলল, তোমার জ্বর কত উঠেছিল জানো ? একশ পাঁচ। গায়ের উপর ধান ছেড়ে দিলে ফুটে খই হয়ে যেত।

তুই কখন এসেছিস ?

ঘড়ি দেখি নাই। দু'টা হবে। এসে দেখি স্যুট পরা কোনো এক বাবু সাহেব তোমার মাথায় পানি ঢালছে।

কে, জয়নাল ?

নাম জিজ্ঞেস করি নাই। তাকে পাঠিয়েছি ডাক্তার আনতে। ভাইজান, সত্যি করে বলো তো— এখন কি একটু ভালো লাগছে ?

রাহেলার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শামসুদ্দিন বললেন, যে পানি ঢালছিল তার মাথায় কি টাক ?

এত কিছু লক্ষ করি নি ভাইজান। আমি বাঁচি না নিজের যন্ত্রণায়। আমি বসে বসে দেখব কার মাথায় টাক কার মাথায় চুল ? সে তো ডাক্তার নিয়ে আসবেই তখন দেখো তার মাথা ভর্তি চুল না টাক।

রফিক কোথায় ?

আমি জানি না কোথায়। একটার সময় এসে ছেলের হাতে এক প্যাকেট বিরিয়ানি ধরিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

মাথায় আর পানি দিস না। ঠাণ্ডা লাগছে।

লাগুক ঠাণ্ডা, ডাক্তার না আসা পর্যন্ত আমি পানি দিতেই থাকব। ভাইজান, তুমি সুস্থ হয়ে উঠ। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। আমি বাসায় ফিরতাম না, শুধু তোমাকে জরুরি কথা বলার জন্যেই ফিরেছি। এসে দেখি তোমার এখন যায় তখন যায় অবস্থা। ডাক্তার এসে তোমাকে দেখে যাক, তারপর তোমাকে জরুরি কথাগুলো বলে চলে যাব।

কোথায় চলে যাবি ? তোর কি থাকার জায়গা আছে ?

জায়গা না থাকলেও চলে যাব। প্রয়োজনে খারাপ পাড়ায় গিয়ে বাড়িওয়ালীকে বলব, এখন আমাকে দিয়ে আপনার চলবে না তবে পেটের বাচ্চা খালাস হয়ে গেলে আমি ভালো রোজগারপাতি করব। আমার চেহারা সুন্দর, গায়ের রঙ ফর্সা। খদ্দেররা আমার ঘরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ভাইজান শোন, আসিয়া যে ফিরে এসেছে তুমি জানো ?

আসিয়াটা কে ?

আসিয়া কে তুমি ভুলে গেছ ? আমাদের কাজের বুয়া। পৃথুর বাবার সহনায়িকা।

ও আচ্ছা!

আমি তাকে বেতন, বেতনের সাথে দু'শ টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। পৃথুর বাবা আজ সকালে তাকে তার বাসায় খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে। সে যে আসিয়ার বস্তির বাসার ঠিকানাও জানে তা জানতাম না।

ও আচ্ছা!

কথায় কথায় ও আচ্ছা বলবে না। কোনো কিছুই আচ্ছা না। ভাইজান, একটু একা একা থাক, আমি পৃথুকে একটা চড় দিয়ে আসি।

কেন ?

টিভি বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলাম, আবার চালু করেছে। বাপ যেমন বদ, ছেলেও সেই পথ ধরবে আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঠোঁটের উপর

গোফ দেখা যাওয়া মাত্র বাবার মতো কাজের মেয়েদের নিয়ে ফস্টিনস্টি শুরু করবে।

পৃথুর কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বেচারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শামসুদ্দিনের মন খারাপ লাগছে। তিনি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন। এখন শরীরটা আগের মতো খারাপ লাগছে না। জ্বর মনে হয় কমতে শুরু করেছে। রাহেলার সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। একবার শুধু শোনা গেছে সে আসিয়াকে বেবীটেক্সি ডেকে আনতে বলছে। আবারো কি ঘর ছেড়ে চলে গেল ?

জয়নাল ডাক্তার আনতে পারে নি। ডাক্তার এখন আর হাউজ কলে উৎসাহী না। তবে সে খালি হাতে আসে নি। এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ওষুধ নিয়ে এসেছে। সাগু দানার মতো ওষুধ। তিনবেলা তিন দানা খেলেই নাকি শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

শামসুদ্দিন একদানা ওষুধ খেলেন। জয়নাল বলল, ওষুধটা ব্লাডে মিশতে দু'ঘন্টা লাগবে। দু'ঘন্টা পরে দেখবেন আপনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছেন।

শামসুদ্দিন বললেন, ঐ রাতে কী হয়েছিল ? তুমি ফিরছই না, আমি খুব দুশ্চিন্তা করেছি।

আপনি দুশ্চিন্তা করেছেন বুঝতে পেরেছি। চাচাজি আমার উপায় ছিল না। ফেঁসে গিয়েছিলাম। আধ ঘন্টার জন্যে গিয়ে ছয় ঘন্টার জন্যে আটকা। ইতিদের বাড়িতে তো আমি আগেও গিয়েছি। ওদের ড্রয়িংরুমে গিয়ে ফকির মিসকিনের মতো বসে থাকা। বাসি টক চানাচুর দিয়ে চা খাওয়া। ইতির বাবার সঙ্গেও কয়েকবার দেখা হয়েছে। তিনি এমনভাবে চোখ মুখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়েছেন যেন আমার সারা গায়ে কাদা লেগে আছে। তাদের সোফাতে কাদা লেগে যাচ্ছে। সালাম দিলেও উনি সালাম নিতেন না। হুঁ বলে শব্দ করতেন।

ঐ রাতে কথা বলেছেন ?

ইস্কাবনের টেক্কা আমার হাতে। কথা বলবে না মানে ? রাজনীতি নিয়ে কথা, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে কথা। আমেরিকায় গিয়ে আমি কী করব তা নিয়ে কথা। আমিও মনের সুখে মিথ্যা কথা বলেছি।

মিথ্যা কী বলেছ ?

বলেছি— আমেরিকায় দু'টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হয়ে আছে। আগে MS করব। আমেরিকায় সেটল করার কোনো ইচ্ছা আমার নাই— সেটল করব নিউজিল্যান্ডে। দেশটা ছোট। মাত্র চল্লিশ লাখ লোকের বাস। বাস করার জন্যে অপূর্ব।

জয়নাল মনের আনন্দে হরবর করে কথা বলে যাচ্ছে। শামসুদ্দিনের শুনতে ভালো লাগছে। তাঁর মাথার ভোঁতা যন্ত্রণাটাও মনে হয় কমে যাচ্ছে।

চাচাজি তারপর শোনেন কী অবস্থা— রাতে তাদের সঙ্গে ভাত খেলাম। ভাত খাওয়ার পর কফি। ইতির দাদি থাকেন কমলাপুরে। সেখান থেকে টেলিফোন— উনি আসছেন। রাতে ইতিদের বাড়িতে থাকবেন। আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে না যাই।

একদিনে তুমি তো মনে হয় অনেকদূর এগিয়েছ।

জি চাচাজি। তিন ঘণ্টা মনের সুখে ব্যাটিং করেছি। প্রতি ওভারে একটা দু'টা ছয়ের মার। আপনার জন্যে খুবই টেনশন হচ্ছিল। আপনি একা বসে আছেন— কী না কী ভাবছেন। এদিকে উঠতেও পারছি না। খেলা এমন জমে উঠেছে— ছক্কার পর ছক্কা মারছি।

তোমার কথা ভালো লাগছে জয়নাল।

শুধু ভালো লাগলে তো চাচাজি হবে না। সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আপনাকেই যেতে হবে। আধমরার মতো বিছানায় পড়ে থাকার টাইম এখন না। এখন হচ্ছে টাইম অব অ্যাকশন। এ সপ্তাহেই আপনাকে নিয়ে সিলেট যেতে হবে।

কেন ?

শাহজালাল সাহেবের দোয়া নিতে হবে না ? তার উপর খুবই খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন কাটান দিতে হবে।

কী স্বপ্ন দেখেছ ?

দেখেছি আমি আর আপনি এয়ারপোর্টে স্যুটকেস ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ইমিগ্রেশন আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমাকে আটকে দিয়েছে। নানানভাবে চেকিং করছে। তারপর দেখি চেকিং করার নামে আমার সব কাপড় খুলে ফেলেছে। আমি পাসপোর্ট হাতে নিয়ে পুরো নেংটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দুনিয়ার লোকজন আমাকে দেখছে আর মুখ টিপে হাসছে। এত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমি গত দশ বছর দেখি নি। স্বপ্নটা দেখার পরে আমার মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে। হয়তো দেখা যাবে আমাকে আটকে দিয়ে, আপনি ডেং ডেং করে প্লেনে উঠে যাবেন।

শামসুদ্দিন বললেন, শোন জয়নাল, তোমাকে রেখে আমি আমেরিকা যাব না।

থ্যাংক য়্যু। আমিও আপনাকে ফেলে যাব না। মনটা শান্ত করার জন্যে শুধু শাহজালাল সাহেবের দরগা থেকে ঘুরে আসতে হবে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকা চলে যেতে হবে। দেরি করা যাবে না। আমেরিকানদের ভাবভঙ্গি তো বোঝা মুশকিল— হঠাৎ হয়তো নোটিশ দিয়ে দিল ভিসা হবার তিন মাসের মধ্যে আমেরিকা না গেলে ভিসা ক্যানসেল।

শামসুদ্দিন উঠে বসলেন। জয়নাল বলল, এখন একটু ভালো বোধ করছেন না? মেডিসিন কাজ করা শুরু করেছে। হোমিওপ্যাথির ট্যাবলেট ছোট ছোট, কিন্তু অ্যাকশানে মারাত্মক।

শামসুদ্দিনের মনে হলো— আসলেই তাঁর শরীরটা ভালো লাগছে। তাঁর ইচ্ছা করছে জয়নালের সঙ্গে বের হয়ে যেতে। এ বাড়ির সমস্যাগুলি খুবই জটিল হতে শুরু করেছে। রাহেলা সত্যি সত্যি আবারো চলে গেছে। যেখানেই যাক রাতে নিশ্চয়ই ফিরবে। তখন রফিকের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া শুরু হবে। পৃথু অকারণে মার খাবে। এর মধ্যে থাকতে ইচ্ছা করছে না। একেবারেই ইচ্ছা করছে না।

টিম্বার মার্চেন্ট এস আলম অ্যান্ড সন্স এর অফিসে তিনঘণ্টা দশ মিনিট ধরে জয়নাল বসে আছে। এস আলম সাহেবের সঙ্গে জয়নালের দেখা হয়েছে। জয়নাল তাঁকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছে যে তার কিছু টাকা দরকার। সাহায্য না, ঋণ। ছ'মাসের জন্য সুদমুক্ত ঋণ। আমেরিকায় যাবার টিকিট কেনার জন্যে টাকাটা দরকার। একজনের কাছ থেকে সে পুরো টাকা নেবে তা না। অনেকের কাছ থেকে নেবে এবং ছ' মাসের মধ্যে পুরোটা ফেরত পাঠাবে।

এস আলম সাহেব যে জয়নালের অপরিচিত তা না। মুখ চেনা পরিচয় আছে। তিনি জয়নালের বন্ধু সিদ্দিকের খালু। সিদ্দিকের ভাষায় তার এই খালু টাকার কুমীর না, টাকার তিমি মাছ।

ভদ্রলোক জয়নালের কথা মন দিয়ে শুনলেন তারপর বললেন, অপেক্ষা কর। জয়নাল অপেক্ষা শুরু করেছে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় তিন ঘণ্টা দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। অফিসে চা-এর ব্যবস্থা আছে। ধবধবে ফর্সা, রোগা টিং টিং-এ একটা ছেলে— তার নাম কানু, সে চাওয়া মাত্র চা দিয়ে যাচ্ছে। তিন ঘণ্টা দশ মিনিটে জয়নাল এগারো কাপ চা খেয়ে ফেলল, সেই সঙ্গে পাঁচটা নোনতা বিসকিট। এক সময় দেখা গেল এস আলম সাহেব অফিস শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা হবার জন্যে বের হলেন। গাড়ি আনতে বললেন। জয়নাল বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, স্যার আমার ব্যাপারটা।

এস আলম সাহেব পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাঁচশ টাকার একটা নোট বের করে জয়নালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিয়ে যাও। এটা ফেরত দিতে হবে না।

জয়নাল বলল, স্যার আমি পাঁচশ টাকার জন্যে আপনার কাছে আসি নি।

এস আলম সাহেব পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। নিলে নাও, না নিলে নাই।

জয়নাল বলল, থাক লাগবে না।

এস আলম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে টাকা মানিব্যাগে ঢুকিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলেন। জয়নাল মনে মনে বলল— 'যা কুত্তা'।

টিকিটের টাকা জোগাড়ের জন্যে জয়নাল একচল্লিশ জনের একটা তালিকা করেছে। একচল্লিশ জনের মধ্যে তার আত্মীয়স্বজন আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, বন্ধু-বান্ধবের আত্মীয়স্বজন আছে। গত পাঁচ বছরে জয়নাল যে সব ছাত্র-ছাত্রীকে পড়িয়েছে তাদের বাবা-মা আছে। টাকা সংগ্রহ অভিযান যেমন হবে ভাবা গিয়েছিল তেমন মনে হচ্ছে না। সবাই টিম্বার মার্চেন্ট এস আলমের মতো আচরণ করছে। জয়নালের কয়েকজন ছাত্রের বাবা-মা জয়নালকে চিনতেই পারল না। একজন ছাত্রের মা বলল, আপনি মিঠুকে পড়িয়েছেন ? কবে ? আশ্চর্য কথা! মিঠু কখনো প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে বলে তো মনে হয় না। আপনার কথাবার্তা খুবই সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। আপনি চলে যাবেন না। মিঠু স্কুল থেকে ফিরুক। আপনাকে আইডেনটিফাই করুক, তারপর যাবেন। মিঠু যদি আপনাকে আইডেনটিফাই করতে না পারে তাহলে আমি কিন্তু আপনাকে পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব।

জয়নাল চোখ মুখ শুকনা করে ড্রয়িংরুমে বসে মিঠুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার একটা ভয় মিঠু যদি তাকে চিনতে না পারে তাহলে কী হবে! ভিক্ষা চাই না মা কুত্তা সামলাও অবস্থা। মিঠু ফিরল বিকেল পাঁচটায়। সে জয়নালকে দেখেই বলল, স্যার কেমন আছেন ? আপনার মাথার সব চুল পড়ে গেছে কেন ?

মিঠুর মা বললেন, সরি আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। বাধ্য হয়ে প্রিকশান নিতে হয়েছে। ঢাকা শহর জুয়াচোরে ভর্তি হয়ে গেছে। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। যাই হোক, আপনাকে আমরা কোনো সাহায্য করতে পারব না। আমাদের নিজেদেরই অর্থনৈতিক ক্রাইসিস যাচ্ছে। জয়নাল সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল— 'দূর মোটা কুত্তি।'

উৎসাহজনক কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না— তাতে জয়নাল মোটেই চিন্তিত না। নেত্রকোনায় তাদের যে বসতবাড়ি আছে সেটা জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করার জন্যে সে তার বড় চাচাকে চিঠি দিয়েছে এবং টেলিগ্রাম করেছে। দশ কাঠা জমির উপর বাড়ি। কাঁঠাল বাগান আছে, আম বাগান আছে। বাড়ির পেছনে ছোট পুকুর আছে। খুব কম করে হলেও জমির দাম পাঁচ লাখ টাকা হওয়া উচিত। পানির দামে বিক্রি করলেও দু' লাখ টাকা আসবে। পৈতৃক ভিটা বিক্রি করলে বাবা-মা'র অভিশাপ লাগে এই ভেবে এত অভাবেও বিক্রির চিন্তা মাথায় আসে নি। এখন বাধ্য হয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে। তাছাড়া জয়নালের ধারণা আমেরিকার মতো দূর দেশে অভিশাপ পৌছবে না। সে ঠিক করে রেখেছে বাড়ি বিক্রির টাকাটা চলে এলে এখানকার সমস্ত ঋণ শোধ করবে। খাসি জবেহ করে বন্ধু-বান্ধবদের একটা পার্টি দেবে। তার বিয়েটা যদি হয়েই যায় সেখানেও কিছু

খরচ আছে। হাজার বিশেক টাকা ইতির হাতেও ধরিয়ে দিয়ে যেতে হবে। বিয়ের পরেও মেয়ে বাবা-মা'র হাত থেকে খরচ নেবে সেটা তো হয় না। তবে ইতির যা খরচের হাত মনে হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকা উড়িয়ে দেবে। এরও একটা ভালো দিক আছে— যে সব স্ত্রী খরুচে তাদের স্বামীরা ভালো রোজগার করে। কৃপণ স্ত্রীদের স্বামীরা আয় উন্নতি করতে পারে না। শাস্ত্রের কথা।

জয়নালের বিয়ের ব্যাপারটা কিছু অগ্রগতি হয়েছে। শামসুদ্দিন প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েপক্ষ হ্যাঁ না বললেও সরাসরি নাও বলে নি। মেয়ের এক ফুপা অবশ্যি বলেছেন— বাপ-মা নেই ছেলে। এটা একটা সমস্যা। মেয়ে কোনোদিন শ্বশুরশাশুড়ির আদর পাবে না।

মেয়ের ফুপা বললেন, এতিম ছেলে দুর্ভাগ্যবান হয়।

শামসুদ্দিন বলেছেন, খুবই ভুল কথা বললেন। আমাদের নবী এ করিম সাল্লালাহু আলায়ে সালাম ছিলেন এতিম। তিনি কি দুর্ভাগ্যবান?

জয়নাল শামসুদ্দিন সাহেবের কথাবার্তায় মুগ্ধ। আলাভোলা টাইপের এই লোক যে এত গুছিয়ে কথা বলবে এটা ভাবাই যায় না। মেয়ের বাবা যখন বললেন, আপনি কি ছেলের আপন চাচা? তখন শামসুদ্দিন সাহেবের জবাব দেবার আগেই জয়নাল বলেছে, জি আপন চাচা। উনিও আমার সঙ্গে আমেরিকা যাচ্ছেন। ভিসা পেয়ে গেছেন। উনি যাচ্ছেন বেড়াতে। উনার আবার দেশ-বিদেশ ঘুরার শখ। অনেক দেশ ঘুরেছেন। আমেরিকাটা বাকি আছে। ইনশাল্লাহ এইবার আমেরিকাও দেখবেন।

মেয়ের বাবা অবাক হয়ে বললেন, বেড়াবার জন্যে আমেরিকা যাচ্ছেন? শামসুদ্দিন সাহেব এবারও জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। জয়নাল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমেরিকার ভেলেভু হাসপাতালে উনি জেনারেল চেকআপ করবেন, তাঁর স্বাস্থ্যটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। হাঁচির সমস্যা হচ্ছে। দেশে ট্রিটমেন্টের যে অবস্থা!

পাত্রীপক্ষ হ্যাঁ না বললেও জয়নাল প্রায় সত্তুর ভাগ নিশ্চিত যে বিয়েটা হয়ে যাবে। সে স্বপ্নে দেখেছে তার বিয়ে হচ্ছে। নৌকায় করে বরযাত্রী যাচ্ছে। বরযাত্রীর মধ্যে তার বাবাও আছে। সে বাবাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, আপনি না মারা গেছেন! আপনি এখানে আসলেন কীভাবে? জয়নালের কথায় বিরক্ত হয়ে তার বাবা বললেন, তুই ছোটবেলায় যেমন গাধা ছিলি এখনো দেখি সেরকম গাধাই আছিস। মারা গিয়েছি বলে ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী আসব না? এ ধরনের স্বপ্ন দেখার একটাই মানে— বিয়ে হবে। বিয়ের জন্যে তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত। আংটি কিনতে হবে, শাড়ি কিনতে হবে। বিয়ের পর একদিনের জন্যে

হলেও কনেকে স্বামীর বাড়ি যেতে হয়। স্বামীর বাড়িটা কোথায় যে সে যাবে? ইতিকে নিয়ে সে নিশ্চয়ই গ্যারেজের উপরের ঘরে উঠতে পারে না।

সোমবার জয়নালের জন্যে খুব ভালো দিন। তার জীবনে ভালো কিছু ঘটে নি। তারপরেও যা কিছু শুভ তা ঘটেছে সোমবারে। সর্বশেষ আমেরিকান ভিসা এটাও সোমাবারে পাওয়া। সোমবার শুধু মাত্র এই কারণে জয়নালের মন ভালো থাকে। ঘুম ভাঙার পর মনে হয়, আহ কী শুভ দিন!

আজ সোমবার। জয়নাল ঠিক করে রেখেছে নিউ মার্কেট থেকে টাটকা একটা চিতল মাছ কিনে ইতিদের বাসায় দিয়ে আসবে। তাকে বলবে তার এক বন্ধুর হাওরে জলমহাল আছে। সেখান থেকে মাছ পাঠিয়েছে। সে একা মানুষ, এত বড় মাছ দিয়ে কী করবে? কাজেই মাছটা দিয়ে গেল। নিজের বুদ্ধিতে জয়নাল নিজেই মুগ্ধ এবং আনন্দিত হলো। আনন্দ স্থায়ী হলো না— সোমবার শুভদিনে তার জন্যে এক দুঃসংবাদ এসে উপস্থিত হলো। মেজো চাচা দেশ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে লেখা—

> বাবা জয়নাল,
>
> দোয়াগো
>
> তোমার চিঠি এবং টেলিগ্রাম যথা সময়ে পাইয়াছি। চিঠি এবং টেলিগ্রাম পড়িয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলাম। ঘটনা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের বসত বাড়ি বড় ভাইজান জীবিত থাকা অবস্থাতেই উনার নিকট হইতে আমি খরিদ করি।
>
> এই জমির খাজনা আমি নিজের নামে পরিশোধ করিতেছি। তারপরও তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহা হইলে খাজনা পরিশোধ রসিদ দেখিয়া যাইতে পার।
>
> তুমি আমেরিকা যাইতেছ শুনিয়া আমি এবং তোমার চাচি দুইজনেই অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। দোয়া করি আল্লাহ তোমাকে সুখী করুন। আমেরিকা রওনা হইবার পূর্বে অতি অবশ্যই তুমি দেশের বাড়িতে বেড়াইয়া যাইবা।
>
> ইতি
>
> তোমার চাচা
>
> ইদরিস আলী

খারাপ সংবাদের নিয়ম হলো, একটা খারাপ সংবাদের পর পর দ্বিতীয় খারাপ সংবাদটা আসে। খারাপ সংবাদ কখনো একা আসতে পারে না। জয়নালের ক্ষেত্রেও তাই হলো— চাচার চিঠি পড়ে হতভম্ব ভাবটা দূর হবার

আগেই দোকানে সিগারেটের দাম দিতে গিয়ে লক্ষ করল কোটের পকেটে মানিব্যাগ নেই। জয়নালের মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। কারণ মানিব্যাগের সঙ্গেই তার পাসপোর্ট। মানিব্যাগের সঙ্গে পাসপোর্টও নেই। এমন কি হতে পারে সে বাসায় পাসপোর্ট এবং মানিব্যাগ রেখে এসেছে? হে আল্লাহ পাক তাই যেন হয়। যদি তাই হয় আমি এক হাজার রাকাত শুকরানা নামাজ পড়ব।

বেলা দু'টা নাগাদ জয়নাল নিশ্চিত হলো তার মানিব্যাগ এবং পাসপোর্ট দুটাই পকেটমার হয়েছে। দুটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত সে এক নাগাড়ে রাস্তায় হাঁটল। উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের হাঁটা। মাথায় কোনো চিন্তা নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, শুধুই হাঁটা। ফার্মগেটের ওভারব্রিজে উঠে একবার তার মনে হলো, চিৎকার করে বলে— আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন! সবাই আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। কেন এ ধরনের চিন্তা মাথায় এলো তাও সে জানে না। সে ওভারব্রিজের রেলিং-এ হাত রেখে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাচ্ছে— রাস্তা ভর্তি লোকজন, গাড়ি, ট্রাক, বাস। সবাই কত ব্যস্ত, একমাত্র তার কোনো ব্যস্ততা নেই। সন্ধ্যা না মিলানো পর্যন্ত সে ফার্মগেট ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে রইল।

শামসুদ্দিন কিছুক্ষণ আগে মাগরেবের নামাজ শেষ করেছেন। ফরজের পর দু'রাকাত সুন্নত পড়বেন এই সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ঘর নিকষ অন্ধকার হয়ে গেল। পুরোপুরি অন্ধকার ঘরে না-কি নামাজ পড়তে নেই। সামান্য আলো হলেও নাকি থাকতে হবে। শামসুদ্দিন জায়নামাজে বসে রইলেন। ঘরের পরিস্থিতি আজ ভয়াবহ। কিছুক্ষণ আগেও থালা বাসন ভাঙার শব্দ আসছিল। রাহেলা কিছুদিন হলো রাগ দেখানোর নতুন পদ্ধতি হিসেবে থালা বাসন ছুড়ে ছুড়ে মারছে। কোনো একদিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। শামসুদ্দিন ঠিক করলেন— আজ রাতে কোনো এক সময় তিনি রাহেলার সঙ্গে কথা বলবেন। শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। রফিকের সঙ্গে কথা বলে আসিয়া মেয়েটাকে বিদায় করার চেষ্টা করবেন।

মোমবাতি জ্বালিয়ে রফিক ঘরে ঢুকল। টেবিলের উপর মোমবাতি বসাতে বসাতে বলল, ভাইজানের নামাজ শেষ হয়েছে?

দু'রাকাত সুন্নত বাকি আছে।

নামাজ শেষ করুন। আমি চা নিয়ে আসছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে ভাইজান।

শামসুদ্দিন নামাজ শেষ করলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন নামাজ হয় নি। তিনি নামাজে মন দিতে পারেন নি। আত্তাহিয়্যাতু সূরায় দু'বার গণ্ডগোল হলো। গোড়া থেকে পড়তে হলো। ঘরের ভেতর থেকে রাহেলার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পাওয়া

যাচ্ছে। ফোঁপানোর সঙ্গে সঙ্গে সে বলছে— তুমি আমার গায়ে হাত তুললে ? তুমি এতটা নিচে নামলে ? শামসুদ্দিনের মন খুবই খারাপ হয়েছে। গর্ভবতী কোনো স্ত্রীর গায়ে স্বামী হাত তুলতে পারে ? কী অসম্ভব ব্যাপার!

রফিক চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। এক কাপ চা, এক বাটি তেল মরিচ দিয়ে মাখা মুড়ি। শামসুদ্দিন চায়ের কাপ হাতে নিলেন। রফিক বলল, ভাইজান, আপনি এত মন খারাপ করে থাকবেন না। আমি রাহেলার গায়ে হাত তুলি নি। এই কাজটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না। আমি শুধু বলেছি— 'এক থাপ্পর লাগাবো।' এতেই সে আউলায়ে গেছে। এই কথাটাও আমার বলা উচিত হয় নি। কী করব ভাইজান বলুন, আমি রাগটা সামলাতে পারি নি।

শামসুদ্দীন ক্ষীণ গলায় বললেন, একজন অসুস্থ মানুষ এটা তো রফিক তোমার মাথায় রাখতে হবে।

রফিক হতাশ গলায় বলল, ভাইজান আমি এটা মনে রাখি কিন্তু আমারো তো ধৈর্যের সীমা আছে। আমি তো রোবট না। আমি মানুষ। নিজে নানা সমস্যার মধ্যে থাকি। ব্যবসায়িক অবস্থা খারাপ। সংসার টানতে না পারার লজ্জায় ছোট হয়ে থাকি। এর মধ্যে যদি...

কথা শেষ না করে রফিক সিগারেট ধরাল। শামসুদ্দিন বললেন, সমস্যাটা কি আসিয়া নামের কাজের মেয়েটাকে নিয়ে ? তাকে নিয়ে সমস্যা হলে মেয়েটাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আনলে হয়।

রফিক অবাক হয়ে বলল, আসিয়াকে নিয়ে কী সমস্যা ?

শামসুদ্দিন চুপ করে গেলেন। তাঁর কাছে মনে হলো প্রসঙ্গটা তোলাই উচিত হয় নি। রফিক বিব্রত গলায় বলল, সমস্যাটা ভাইজান আপনাকে নিয়ে।

শামসুদ্দিন হতভম্ব হয়ে তাকালেন। চা গলায় আটকে বিষম খাওয়ার মতো হলো। রফিক বলল, যে রাতে আপনি জ্বর নিয়ে বাসায় ফিরলেন সেই রাতের ঘটনা। আপনার অবস্থা দেখে রাহেলা শুরু করল কান্না। মরা কান্না বলে যে কথা আছে সেই কান্না। আমি এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বললাম, ভাইজানের জ্বর এসেছে। এমন কোনো সিরিয়াস ব্যাপার তো না। তুমি মরা কান্না শুরু করেছ কেন ? এখন তো আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে লোকজন ছুটে আসবে। তখন সে রেগে গিয়ে বলল, কেন কাঁদছি শুনবে ? আমি ভাইজান ডাকলেও উনি আমার ভাই না। তাঁর সঙ্গে ছোটবেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার মা গোপনে মৌলানা ডাকিয়ে কবুল পড়িয়ে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছ কেন চিৎকার করে কাঁদছি ?

শামসুদ্দিন চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন। রফিক নিচু গলায় বলল, ভাইজান, আমি জানি কথাগুলি মিথ্যা। এই নিয়ে আমার মনে কোনো রকম

সন্দেহ নাই। রাহেলা অসুস্থ। আপনাকে সে খুবই পছন্দ করে। মানসিক অসুস্থতা, অতিরিক্ত পছন্দ সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা রাহেলার মাথায় জট পাকিয়ে গেছে। ভাইজান, আপনি এইভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? আমার খুব খারাপ লাগছে। নেন, একটা সিগারেট নেন।

শামসুদ্দিন হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন তিনি সিগারেট ধরাতে পারছেন না। তাঁর হাত কাঁপছে। রফিক বলল, ভাইজান, আমি খুব লজ্জিত যে আপনাকে এত বড় অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছি। রাহেলা এতটা অসুস্থ ছিল না। আপনি আমেরিকা যাবেন এটা শোনার পর থেকে সে পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি যে কী বিপদে পড়েছি— এক আল্লাহপাক জানেন। আর কেউ জানে না।

আমি যদি অন্য কোথাও চলে যাই তাতে কি সুবিধে হবে?

ভাইজান, আমি বুঝতে পারছি না।

আমি কি বিষয়টা নিয়ে রাহেলার সঙ্গে কথা বলব?

এটাও তো বুঝতে পারছি না।

পৃথুর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রফিক উঠে শোবার ঘরের দিকে রওনা হলো। শামসুদ্দিন সিগারেট হাতে মূর্তির মতো বসে রইলেন। তাঁর কাছে মনে হলো— তাঁর চারপাশের ঘর-বাড়ি দুলছে। ভূমিকম্প হচ্ছে। এক্ষুণি মাথার উপরের ছাদ ভেঙে নিচে নেমে আসছে।

শোবার ঘরে পৃথু মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাত চাপা দিয়ে কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। থামাতে পারছে না। হাতের ফাঁক দিয়ে চাপা কান্না বের হয়ে আসছে। রাহেলা ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি কঠিন। তার এক হাতে মাছ কাটার বটি। পৃথু এক একবার কেঁদে উঠছে, রাহেলা সঙ্গে সঙ্গে বলছে— খবরদার! শব্দ বের হলে বটি দিয়ে গলা কেটে দু'টুকরা করে ফেলব। খবরদার!

রফিক ঘরে ঢুকে বলল, কী হয়েছে?

রাহেলা বলল, তোমাকে বলার মতো কিছু হয় নি।

রফিক বলল, বটিটা আমার হাতে দাও। প্লিজ দাও। পৃথু ভয় পাচ্ছে। বটিটা দাও।

রাহেলা বটি মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, আমাকে একটা বেবিটেক্সি ডেকে দাও। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব না।

রাতের বেলা কোথায় যাবে?

কোথায় যাব এটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

রফিক বলল, রাতটা থাক। সকাল হোক, তুমি যেখানে যেতে চাও আমি দিয়ে আসব।

রাহেলা বলল, ভাইজানের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে গুটগুট করে কী কথা বলেছ ?

উনি আমেরিকা কবে যাবেন, টিকিট হয়েছে কিনা এইসব জিজ্ঞেস করছিলাম।

রাহেলা, একসপ্রেসো কফি খাবে ? মোড়ে একটা নতুন ফাস্ট ফুডের দোকান হয়েছে, তারা খুব ভালো একসপ্রেসো কফি বানায়। এক কাপ দশ টাকা। খাবে ?

রাহেলা কিছু বলল না। রফিক উৎসাহের সঙ্গে বলল, নিয়ে আসি এক কাপ কফি। ভালো না লাগলে ফেলে দিও। পৃথু ব্যাটা, কফি খাবি নাকি ?

পৃথু চোখ মুছতে মুছতে বলল, খাব।

তাহলে চল তোকে কফি খাইয়ে আনি আর তোর মার জন্যে কফি নিয়ে আসি। তার আগে একটা কাজ কর বাবা, যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। সার্ট পর। জুতা পায়ে দে। তুই কি নিজে নিজে জুতার ফিতা বাঁধতে পারিস ?

পারি।

ভেরি গুড। আমার সামনে জুতার ফিতা বাঁধ। ফিতা বাঁধা পরীক্ষা হবে।

পৃথু হেসে ফেলে বাথরুমের দিকে রওনা হলো। একটু আগেই পরিস্থিতি কী ভয়ঙ্কর ছিল! তার মা আরেকটু হলে বটি দিয়ে তাকে কেটেই ফেলত। বাবা এসে ফুঁ মন্ত্র দিয়ে সব ঠিক করে দিল। বাবার মধ্যে 'পাওয়ার' আছে। সুপারম্যান, স্পাইডারম্যানের মতো পাওয়ার। তবে বাবার পাওয়ারটা দেখা যায় না।

রাহেলা খাটে এসে বসেছে। তাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। রফিক বলল, শরীরটা কি খারাপ লাগছে ?

রাহেলা বলল, সামান্য খারাপ লাগছে।

রফিক বলল, রেস্ট নাও। ঠিক হয়ে যাবে।

রাহেলা বলল, ভাইজান হঠাৎ করে আমেরিকা যাবার জন্যে কেন পাগল হয়েছে এটা আমি চিন্তা করে বের করে ফেলেছি।

কেন আমেরিকা যাচ্ছেন ?

বীথির সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

বীথিটা কে ?

ভাইজান এক সময় ব্যাংকে চাকরি করত। বীথি নামের একটা মেয়ে ছিল তাঁর কলিগ। ভাইজানের সঙ্গে বীথির বিয়ে ঠিক হলো। বরযাত্রী নিয়ে ভাইজান বিয়ে করতে গেল নরসিংদি। আমিও ছিলাম বরযাত্রীর দলে। মওলানা এসে বিয়ে পড়াতে গেল। মেয়ে বলল, না। আমি রাজি না। কবুল বলব না।

কেন ?

কেন আমি জানি না। কেউ জানে না। ভাইজান ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নানান দুঃখধন্ধের মধ্যে পড়ল। শেষমেষ একটা স্কুল মাস্টারি জোগাড় করল। সারা জীবন বিয়ে করল না।

বীথি মেয়েটা আমেরিকায় থাকে ?

হ্যাঁ। বিয়ে করে অনেক দিন আগে চলে গেছে। শোন, যেভাবেই হোক ভাইজানের যাওয়া আটকাতে হবে। তাঁকে ঐ মেয়ের সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে দেওয়া হবে না।

অবশ্যই।

রাহেলা চাপা গলায় বলল, ভাইজান আলাভোলা মানুষ। যখন তখন অসুখবিসুখ বাধায়। ভাইজানকে তো আমি কিছুতেই বিদেশের মাটিতে ছাড়ব না।

তাকে ছাড়া উচিতও হবে না।

বাচ্চা হবার সময় আমি বাঁচি না মরি তার নাই ঠিক। তখন যদি ভাইজান কাছে না থাকে তার সঙ্গে তো আমার দেখাই হবে না।

ঐ দিকটা আমি চিন্তা করি নি। আসলেই তো— তোমার বাচ্চা হবার আগে কিছুতেই তাঁকে যেতে দেয়া হবে না। তুমি নিশ্চিত থাক।

পৃথু জুতা পরে এসেছে। সে বাবার সামনে জুতার ফিতা বাঁধার পরীক্ষা দিয়ে বাঁ পায়ের জুতায় ফেল করল। ডান পায়ের জুতায় পাশ করল। রফিক বলল, তুই একশতে পঞ্চাশ পেয়েছিস। এটা খারাপ না। ত্রিশ হলো পাস মার্ক। পাস মার্কের চেয়েও বিশ বেশি পেয়েছিস। চল এবার কফি খেয়ে আসি। রাহেলা তুমিও চল। হাঁটতে হাঁটতে যাই। কাছেই তো।

রাহেলা সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। রফিক বলল, এক কাজ করলে কেমন হয়— পৃথু যেহেতু কঠিন একটা পরীক্ষায় ফিফটি পার্সেন্ট মার্ক পেয়েছে সেই উপলক্ষে চাইনিজ খেয়ে ফেললে কেমন হয় ? অনেকদিন বাইরে খাওয়া হয় না।

পৃথু বলল, খুব ভালো হয় বাবা।

রাহেলা বলল, ভাইজানকে নিয়ে চল। তাকে ফেলে রেখে আমি চাইনিজ খেতে যাব না।

রফিক বলল, কী বলো তুমি তাকে রেখে যাব না-কি ? অবশ্যই তাকে নিয়ে যাব।

শামসুদ্দিন কিছুতেই বাইরে যেতে রাজি হলেন না। শেষে ঠিক হলো তাঁর জন্যে খাবার নিয়ে আসা হবে।

শামসুদ্দিন বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন। হঠাৎ করেই তাঁর শরীর খারাপ করেছে। মাথার দুলুনি প্রবল হয়েছে। বিছানায় শুয়ে থাকলে কম দোলে। উঠে বসলেই চারপাশের জগৎ দুলতে থাকে। মনে হয় তিনি নৌকায় বসে আছেন। নদীতে প্রবল ঢেউ উঠেছে। নৌকা দুলছে। নৌকার সঙ্গে তিনিও দুলছেন।

কলিংবেল বাজছে। রফিকরা গিয়েছে আধঘণ্টাও হয় নি। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে ? শামসুদ্দিন দেয়াল ধরে ধরে এগোলেন। দরজা খুললেন। দরজার ওপাশে জয়নাল দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। যেন সে কোনো মানুষ না। প্রেতলোক থেকে ফিরে এসেছে। শামসুদ্দিন বললেন, জয়নাল, তোমার কী হয়েছে ?

জয়নাল বিড়বিড় করে বলল, চাচাজি পানি খাব।

ঘরে এসে বসো। পানি এনে দিচ্ছি। তোমার এই অবস্থা কেন ? কী হয়েছে।

চাচাজি আমি পাসপোর্টটা হারিয়ে ফেলেছি।

পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছ ?

জি। মানিব্যাগ আর পাসপোর্ট দু'টা এক সঙ্গে ছিল। পিক পকেট হয়ে গেছে।

শামসুদ্দিন শান্ত গলায় বললেন, এসো ঘরে এসে বসো। আমি পানি এনে দিচ্ছি। সারা দিন কিছু খাও নি, তাই না ?

জয়নাল জবাব দিল না। শামসুদ্দিন হাত ধরে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। পানি এনে খাওয়ালেন। তারপর গায়ে হাত রেখে বললেন, তুমি তোমার পাসপোর্টটা আমার কাছে রেখে গেছ। এটা ভুলে গেলে কীভাবে ?

জয়নাল এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে শামসুদ্দিনের কথা বুঝতে পারছে না। শামসুদ্দিন স্যুটকেস খুলে পাসপোর্ট বের করে জয়নালের হাতে দিলেন। জয়নাল পাতা উল্টে নিজের ছবি দেখে অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। শামসুদ্দিনের চোখে পানি এসে গেল। তিনি পরপর তিনবার বললেন— আহারে! আহারে! আহারে!

অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নড়ছে। জয়নাল উঠতে পারছে না। কড়াইয়ে তেল গরম হচ্ছে, ডিমের ওমলেট হবে। কাঁচা তেলে ডিম ঢেলে দিলে তেলের গন্ধ থাকবে। তেল বেশি গরম হয়ে গেলে আবার ধক করে তেলে আগুন জ্বলে উঠবে। এই কড়াইটার হয়তো কোনো সমস্যা আছে। তেল সামান্য গরম হলেই আগুন লেগে যায়।

জয়নাল বলল, কে ?

যে কড়া নাড়ছিল সে জবাব দিল না। আরো জোরে কড়া নাড়তে লাগল। মনে হচ্ছে বাড়িওয়ালা কেয়ারটেকারকে পাঠিয়েছে। মাত্র দু'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, ব্যাটার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক পাঠাচ্ছে। জয়নাল মনে মনে বলল, দূর কুত্তা। তেল মনে হয় গরম হয়েছে। সে ধীরেসুস্থে ডিম ঢালল। আজকের ওমলেটটা মনে হয় অসাধারণ হবে, কারণ ডিমে দুই চামচ দুধ দেয়া হয়েছে। ওমলেটটা সোনালি বর্ণ ধারণ করে ফুলে উঠছে।

এখন শুধু যে কড়া নড়ছে তা-না, দরজায় ধাক্কাও পড়ছে। জয়নাল তেমন পাত্তা দিল না। ওমলেট কড়াই থেকে নামিয়ে দরজা খোলার জন্যে রওনা হলো। কেয়ারটেকার ব্যাটাকে কী বলতে হবে মনে মনে ঠিক করে ফেলল। তাকে বলতে হবে— সোমবার সন্ধ্যাবেলায় এসে টাকা নিয়ে যাবেন। পাওনাদারদের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলে বুঝ দিতে হয়। পরে এসে টাকা নিয়ে যাবেন বললে এরা বুঝ মানে না। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বললে বুঝ মানে।

দরজা খোলার পর জয়নালের মাথা চক্কর দিয়ে উঠল, তার মনে হচ্ছে এক্ষুণি মাথা ঘুরে হুড়মুড় করে সিঁড়িতে পড়ে যাবে। গড়াতে গড়াতে নেমে যাবে এক তলায়। কড়া নাড়ছে ইতি। ইতি না হয়ে যদি পিঠে ডানা লাগানো সত্যিকার কোনো পরী দেখত তাহলেও এত অবাক হতো না।

ইতি বলল, আপনি কি এই গুহায় বাস করেন ? এতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি দরজা খুলছিলেন না কেন ?

জয়নাল বলল, আমার এই ঠিকানা কোথায় পেয়েছ ?

আলম ভাইয়ের কাছ থেকে জোগাড় করেছি। আপনি কি আমাকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না ভেতরে ঢুকতে দেবেন ?

এসো, ভিতরে এসো।

দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ান। আমি কি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকব না-কি ?

জয়নাল এক পাশে সরল। তার মাথার চক্কর এখনো থামে নি। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা এখনো আছে। ইতি ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে চারদিক দেখছে।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় ডিম ভাজছেন কেন ? এটা আপনার সকালের নাশতা না-কি দুপুরের লাঞ্চ ?

জয়নাল বলল, ওমলেট খাবে ইতি ?

ইতি বলল, কী আশ্চর্য কথা, দুপুর সাড়ে এগারোটার সময় আমি ওমলেট খাব কেন ? আপনি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না, একটা সার্ট গায়ে দিন। খালি গায়ে ঘুরছেন। কুৎসিত লাগছে। লুঙ্গি এত উঁচু করে পরেছেন কেন ? টেংরা টেংরা পা দেখা যাচ্ছে। লুঙ্গি তো আর হাফপ্যান্ট না। লুঙ্গি পরতে হয় লুঙ্গির মতো।

জয়নাল খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। কী অবস্থা! পরীর চেয়ে দশগুণ সুন্দরী একটা মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর সে কিনা খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু একটা লুঙ্গি পরে হাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছে! লুঙ্গি নামাতে যাওয়াও এখন ঠিক হবে না। হাত যেভাবে কাঁপছে লুঙ্গির গিঁট খুলতে গিয়ে অঘটন ঘটে যেতে পারে। আগে লম্বা একটা পাঞ্জাবি পরা দরকার। ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি দুটা থাকার কথা। এখন হয়তো পাঞ্জাবিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা বিপদ যখন আসে তখন সেই বিপদের লেজ ধরে আরেকটা বিপদ আসে। দেখা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িওয়ালা কেয়ারটেকারকে পাঠাবে। সেই কুত্তা কেয়ারটেকার ইতির সামনেই বাড়ি-ভাড়া নিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করবে।

জয়নাল বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন ইতি, বসো। চা খাবে ?

ইতি বসতে বসতে বলল, না।

কোক পেপসি এইসব কিছু খাবে ? আনিয়ে দিই ?

কিচ্ছু আনিয়ে দিতে হবে না। আপনি আমাকে দেখে এত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন কেন ?

তুমি আসবে ভাবি নি তো।

ইতি বসতে বসতে বলল, আপনার গুহা খুবই অদ্ভুত, কিন্তু সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন। সুন্দর একটা পেইন্টিংও দেখি আছে। পেইন্টিংটা কার ?

আমার এক বন্ধুর আঁকা। আর্ট কলেজে পড়ত, থার্ড ইয়ারে উঠে পড়া ছেড়ে দিল।

কেন ?

মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। এখন গাঁজা-টাজা খায়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। ওর নাম— আবদুর রহমান।

উনার ছবিটা তো অসম্ভব সুন্দর। আমি ছবি থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ছবির মেয়েটা কে ?

ইতি একদৃষ্টিতে ছবি দেখছে এটা একটা ভালো সুযোগ। জয়নাল ইতির পেছনে দাঁড়িয়ে অতি দ্রুত কাপড় বদলাচ্ছে। তার ভাগ্য ভালো, মেরুন রঙের ইস্ত্রি-করা পাঞ্জাবিটা পাওয়া গেছে। এই পাঞ্জাবিটাতেই তাকে সবচে' সুন্দর মানায়। কালো প্যান্টের সঙ্গে মেরুন কালারের পাঞ্জাবি।

ছবির মেয়েটা কে আমি জানি না। রহমানের কাছ থেকে ছবিটা কিনেছিলাম।

কত দিয়ে কিনেছেন ?

রহমানের মাথা খারাপ তো! ছবির দাম উল্টা-পাল্টা লিখে রেখেছিল। পনেরো হাজার লেখা ছিল। আমি তাকে দু'প্যাকেট বেনসন সিগারেট দিয়ে ছবি নিয়ে চলে এসেছি।

কী বলেন আপনি!

বন্ধু মানুষ তো! কিছুক্ষণ কাউ কাউ করে বলেছে— যা ছবি নিয়ে ভাগ। একদিন দেখবি এই ছবিই আট-দশ লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারবি। ছাগলটা নিজেকে কী যে ভাবে!

যে এত সুন্দর ছবি আঁকে সে নিজেকে কিছু একটা ভাবতেই পারে।

ইতি এখনো ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। জয়নালও এবার আগ্রহের সঙ্গে তাকাল। রহমানের ছবি নিয়ে এসে সে তার ঘরে টানিয়ে রেখেছে ঠিকই— কোনোদিন এইভাবে দেখা হয় নি। জঙ্গলের ছবি। শীতকালের জঙ্গল। গাছের পাতা বিবর্ণ। বেশিরভাগ গাছেরই পাতা ঝরে গেছে। আবার কুয়াশাও আছে। পনেরো-ষোল বছরের এক গেঁয়ো মেয়ে জঙ্গলে এসেছে শুকনা পাতা এবং খড়ি টোকাতে। তার হাতে ভারি খড়ির বোঝা। তার মুখটা এমনভাবে আঁকা যেন মনে হয় সে তার সামনের একজনকে বলছে, বোঝাটা খুব ভারি। কষ্ট করে আমার মাথায় তুলে দিন তো!

ইতি বলল, আবদুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন।

জয়নাল বলল, তার সাথে অনেক দিন দেখা হয় না। যদি দেখা হয় ধরে তোমাদের বাসায় নিয়ে যাব।

এটা জয়নালের মুখের কথা। আবদুর রহমানকে সে কোনোদিনও ইতির বাসায় নিয়ে যাবে না। ইতি চ্যান বেঙ টাইপ মেয়ে, যে-কোনো ছেলের সাথে তার ইয়ে হয়ে যেতে পারে।

ইতি বলল, আমি খুঁজে খুঁজে আপনার ঠিকানা বের করে কেন এসেছি বলুন তো ?

কেন এসেছ ?

আপনাকে দু'টা খবর দিতে এসেছি। একটা খারাপ খবর একটা ভালো খবর। কোনটা আগে বলব ?

খারাপ খবরটাই আগে বলো।

আগে খারাপ খবর শুনলে ভালো খবর শুনতে চাইবেন না। খারাপ খবরটা আগে বলব ?

হুঁ।

খারাপ খবর হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলিতে আপনাকে নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে। ফ্যামিলির সবার সিদ্ধান্ত আপনার কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় না।

ও, আচ্ছা!

আমার খালু সাহেব আপনার সম্পর্কে কী বলেছেন জানেন ? উনি বলেছেন— ঐ ছেলে বিরাট ধান্ধাবাজ। আমেরিকায় পৌঁছে হয় সে গ্যাস স্টেশনে কাজ নিবে, গাড়িতে তেল ভরবে, আর নয়তো হোটেলে থালাবাসন মাজবে। দেশে চিঠি লিখবে আমি ডিসি পোস্ট পেয়েছি। অর্থাৎ ডিস ক্লিনার। এই ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া আর মেয়ে কেটে টুকরা টুকরা করে ইছামতি নদীতে ফেলে দেয়া এক জিনিস।

জয়নাল বলল, এত নদী থাকতে ইছামতি নদীর কথা আসল কী জন্যে ?

ইতি বলল, খালু সাহেবের বাড়ি ইছামতি নদীর পাড়ে, এই জন্যে ইছামতি নদীর কথা এসেছে।

ও, আচ্ছা!

আর আমার মা বলেছেন, বাপ-মা মরা এতিম ছেলে। এতিমকে সাহায্য করা যায়, এতিমের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় না।

ও, আচ্ছা!

আর আমার বাবা আপনার সম্পর্কে বলেছেন— ফাজিল টাইপ ছেলে, সারাক্ষণ কথা বলে, এমন ভাব ধরে কথা বলে যেন দুনিয়ার সব কিছু জানে।

এর কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। চালবাজ জামাই আমার পছন্দ না। এই হলো খারাপ সংবাদ। এখন ভালো সংবাদটা শুনবেন ?

এর পরে ভালো সংবাদ আর কী থাকবে ?

এরপরেও ভালো সংবাদ আছে। ভালো সংবাদটা হলো পারিবারিক সব আলোচনা হবার পর আমি আমার মা'কে ছাদে ডেকে নিয়ে বলেছি— মা, আমাকে কেটে টুকরা টুকরা করে ইছামতি নদীতে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা কর। আমার কথার মানে বুঝতে না পেরে মা হা করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার ধারণা আপনিও আমার কথার মানে বুঝতে পারছেন না। কারণ আপনিও হা করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনি কি আমার কথার মানে বুঝতে পেরেছেন ?

না।

থাক মানে বোঝার দরকার নেই। আপনি আপনার চাচা শামসুদ্দিন সাহেবকে আমাদের বাসায় পাঠাবেন। বাবা বিয়ের তারিখ নিয়ে কথা বলবেন।

ও, আচ্ছা!

বিয়ে যে করবেন সে রকম টাকা-পয়সা কি আছে ? বিয়ের শাড়ি, গয়না তো লাগবে। লোকজন খাওয়াতে হবে। আপনার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনার টাকা-পয়সা আছে। আমার তো মনে হচ্ছে— আমেরিকা যাবার টিকিটের টাকাও আপনি এখনো জোগাড় করতে পারেন নি।

জয়নাল চুপ করে রইল। তার কাছে সব কিছু কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। অপরূপ রূপবতী একটি মেয়ে তার ঘরের খাটে বসে আছে, পা দুলিয়ে দুলিয়ে এইসব কী বলছে ? জয়নালের গলার কাছটা শক্ত হয়ে আসছে। খুব খারাপ লক্ষণ। চোখে পানি এসে যাবার সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা নষ্ট করতে হবে। চোখে পানি এসে গেলে বিরাট বেইজ্জতি ব্যাপার হবে। জয়নাল মনে মনে বলল, হে আল্লাহপাক, হে পরওয়ারদেগার। চোখে যেন পানি না আসে। এই মেয়েটার সামনে চোখে পানি আসলে আমি বিরাট বেইজ্জতি হব। যদি পানি না আসে তাহলে আমি দশ রাকাত নফল নামাজ পড়ব। একটা ফকিরকে চা নাশতার পয়সা দেব। তোমার কাছে ওয়াদা করলাম।

ইতি পা নাচাতে নাচাতে বলল, আপনি আমার পেছনে লুকিয়ে আছেন কেন ? আপনার চোখে কি পানি এসেছে নাকি ?

আরে না, পানি আসবে কেন। একটা জিনিস খুঁজছি। কোথায় যে রাখলাম।

জিনিসটা কী ?

জয়নাল জবাব দিতে পারল না। আগে থেকে ঠিকঠাক করে না রাখলে মিথ্যা বলা বেশ কঠিন। ইতি বলল, আপনাকে একটা ব্যাপার বলা দরকার। আমার কিন্তু খুব বুদ্ধি। আমাকে বিয়ে করে আপনি মহাবিপদে পড়বেন, কাজেই আনন্দে চোখের পানি ফেলার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি।

বিপদে পড়ব কেন ?

বিপদে পড়বেন কারণ আমি খুবই বুদ্ধিমতী একজন মেয়ে। প্রেম করার জন্যে বুদ্ধিমতী মেয়ে ভালো। বিয়ে করার জন্য বুদ্ধিমতী মেয়ে ভালো না। বিয়ে করার জন্যে ভালো 'জি জনাব' টাইপ মেয়ে। স্বামী যা বলবে মেয়ে ঘাড় কাত করে বলবে— জি জনাব। স্বামী যদি নামাজি হয় সে সঙ্গে সঙ্গে বোরকা পরা শুরু করবে। স্বামীর যদি মদ খাওয়ার অভ্যাস থাকে সেও মদ ধরবে।

জয়নাল মুগ্ধ হয়ে ইতির কথা শুনছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, এই মেয়ে চ্যাঙ বেঙ টাইপ মেয়ে না। এ হলো 'সিরিয়াসিং' কন্যা। যে কন্যা সব বিষয়ে সিরিয়াস সেই কন্যাই সিরিয়াসিং কন্যা।

ইতি বলল, এখন আপনি ঝেড়ে কাশুন। আয়োজন করে বিয়ে করার মতো টাকা পয়সা কি আপনার আছে ?

না।

ধারটার করে জোগাড় করতে পারবেন ?

টিকিটের টাকার জোগাড় এখনো হয় নি।

আমার কাছে বুদ্ধি চান ?

চাই।

আমার দায়িত্ব হলো— বিয়েতে সবাইকে রাজি করানো। সেটা আমি করাব।

কীভাবে ?

আমি শুধু আমার মা'কে রাজি করাব। আমার মা'ও আমার মতোই বুদ্ধিমতী। তিনি রাজি হলে বাকি সবাইকে তিনিই রাজি করাবেন। তখন আপনাদের খবর দেওয়া হবে পান-চিনির অনুষ্ঠানে। আপনি একটা আংটি নিয়ে উপস্থিত হবেন। আংটি কেনার পয়সা কি আছে ?

আছে।

আংটি প্রদান অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবার পর আপনার চাচা শামসুদ্দিন সাহেব কথায় কথায় বলবেন— বিয়ে বাকি রেখে লাভ কী ? একটা কাজি ডেকে নিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিলে কেমন হয়। আপনার চাচার এই কথার পর আমাদের তরফ থেকে একজন বলবে, মন্দ কী ? তারপর কাজি আনতে লোক চলে যাবে।

এত সহজ ?

অবশ্যই সহজ। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না।

আপনাকে যেভাবে বলেছি পুরো ঘটনা আমি এইভাবে ঘটাব। কোনো রকম উনিশ-বিশ হবে না।

জয়নাল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির আহ্লাদি ধরনের কথার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এই রূপের সঙ্গে পরিচয় নেই। ইতি মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, এই কাজটা আমি কেন করছি জানতে চান ? আপনার মনে যাতে কোনো ভ্রান্ত ধারণা না থাকে সে জন্যেই আমার বলে দেওয়া উচিত কাজটা কেন করছি। আপনি মজনু না, আমিও লাইলি না যে আপনার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে এই কাজ করছি। আমার দিক থেকে কারণটা সহজ। খুবই সহজ। আপনি বোকা টাইপের হলেও মানুষ হিসেবে ভালো। যে-কোনো মেয়ে ভালো মানুষ মন্দ মানুষ ব্যাপারটা ধরতে পারে। যে-কোনো মেয়ের চেয়ে আমি আরো তাড়াতাড়ি ধরতে পারি।

ও, আচ্ছা!

আংটি প্রদান অনুষ্ঠানকে বিয়ের অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা কেন করেছি সেটাও বলি। আপনার প্রতি মমতাবশত এই কাজটা কিন্তু আমি করছি না। আমার বাবার প্রতি মমতাবশত কাজটা করছি।

জয়নাল বলল, তুমি কী বলছ বুঝতে পারলাম না।

বাবা সরকারি চাকরি করেন। আগামী বছর রিটায়ার করবেন। সরকারি বাসা ছেড়ে আমাদের একটা ভাড়া বাড়িতে উঠতে হবে। সেই বাড়ির ভাড়া বাবা কীভাবে দেবেন তা তিনি জানেন না। প্রভিডেন্ট ফান্ডে কোনো টাকা নেই। আমার বড় বোনের বিয়ের সময় এক লাখ টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই ঋণ এখনো শোধ হয় নি। বাবার যা অবস্থা আমার বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করার সামর্থ্যও তার নেই। ফাঁকতালে আমার বিয়ে হয়ে গেলে বাবার জন্যেও সুবিধা। টাকা-পয়সা ছাড়া আমার বিয়ে হয়ে গেলে বাবার উচিত কবি নজরুলের বিখ্যাত গানটা গাওয়া— 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।'

জয়নাল মুগ্ধ গলায় বলল, তুমি দেখি খুবই আশ্চর্য মেয়ে!

ইতি বলল, আমি মোটেই আশ্চর্য মেয়ে না। আমি সাধারণ মেয়ে, তবে বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমার বুদ্ধি নিয়ে চললে আপনার জীবনটা অন্যরকম হয়ে যাবে। তবে আমি কোনো বুদ্ধি আপনাকে দেব না।

কেন ?

যে সব স্বামীরা স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলে তারা কেমন ভিজা বিড়ালের মতো হয়ে যায়। তাদের দেখলেই মনে হয় দুবলা পাতলা শিং ভাঙা কালো রঙের একটা গরু। গরুর গলায় দড়ি বাঁধা আছে। তার সামনে কিছু শুকনা খড়। মাঝে মাঝে সে খড় খাচ্ছে আর করুণ চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার ক্ষিধে লেগে গেছে। ডিম ভাজাটা দিন আর একটা চামচ দিন। আমি ডিম ভাজা খাব। দেখি আপনার রান্নার হাত কেমন।

ইতি বেশ আয়োজন করে ডিম ভাজা খাচ্ছে। জয়নালের আফসোস হচ্ছে। ইতি ডিম খাবে জানলে এক বোতল টমেটো সস কিনে রাখত। মিষ্টি ছাড়া যে-কোনো জিনিস মেয়েরা সস দিয়ে খায়। জয়নাল বলল, আমি একটা বিপদে পড়েছি। বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো বুদ্ধি কি তোমার কাছে আছে ?

ইতি বলল, বিপদটা কী রকম ?

আমার চাচা আমার দেশের বসত-বাড়ি দখল করে বসে আছেন। চাচার কাছে আমি একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিটা পড়লে বুঝবে।

আপনি পড়ে শোনান।

জয়নাল চিঠি বের করে পড়তে শুরু করল।

> জনাব মুখলেসুর রহমান,
>
> চাচাজি আমার সালাম নিবেন। কুরিয়ারে পাঠানো আপনার আগের চিঠি পেয়ে আমি খুবই অবাক হয়েছি। আপনি হঠাৎ করে এখন বলছেন যে আমাদের বসত-বাড়ি আপনি নগদ টাকায় বাবার কাছ থেকে কিনেছেন। আপনার কাছে কাগজপত্র আছে। আপনার কাছে খাজনার রশিদও আছে। আপনার কথা পুরোপুরি মিথ্যা। এটা যে মিথ্যা তা আপনি যেমন জানেন, গ্রামবাসীও জানে। বাংলাদেশ মগের মুল্লুক না। এখানে আইন-কানুন আছে। আপনি আমার আপন চাচা, মুরব্বি মানুষ, তারপরেও আমি অবশ্যই থানা পুলিশ করব। ইতিমধ্যে আমি উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। আদালতে দেওয়ানি মামলা রুজু করার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। তারপরেও মিটমাটের সুযোগ আছে। বিদেশ যাত্রার আগে আগে আমার টাকা-পয়সা প্রয়োজন। আপনি জমি বিক্রির ব্যবস্থা করে টাকাটা আমাকে

দিয়ে দিলে আমার বিরাট উপকার হয়। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য বাঞ্ছনীয় নয়। চাচিকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও কদমবুসি। অন্যদের শ্রেণীমতো সালাম ও দোয়া।

ইতি

আপনার স্নেহের জয়নাল

ইতির ডিম খাওয়া শেষ হয়েছে, সে পানি খেল, শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বলল, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিন। এই চিঠিতে কাজ হবে না। আরেকটা চিঠি লিখুন—

চাচাজি, আমার সালাম নিন। পত্রে জানলাম বাবার কাছ থেকে আপনি বসত-বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। খবরটা জানা ছিল না বলে আপনাকে এমন একটি চিঠি লিখেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। জমির দলিল এবং খাজনার রশিদ দেখাতে চেয়েছেন। চাচাজি, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। এখন চাচাজি আমি বিপদে পড়েছি। আমেরিকা যাবার ভাড়া জোগাড় করতে পারছি না। আপনি যদি আমেরিকা যাবার টিকিটের টাকা আমাকে ধার দেন তাহলে খুব উপকার হয়। চাচাজি, আপনি আমার এই উপকারটা করুন। আমি অবশ্যই তিন থেকে চার মাসের মধ্যে টাকাটা ফেরত দেব। চাচিজিকে আমার সালাম।

ইতি

আপনাদের স্নেহের জয়নাল

ইতি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, যেভাবে বললাম, ঠিক সেইভাবে চিঠি লিখে দেখুন উনি যদি কিছু পাঠান সেটাই হবে আপনার লাভ। অন্য কোনোভাবে কিছু করতে পারবেন না।

জয়নাল মুগ্ধ চোখে ইতির দিকে তাকিয়ে আছে। এমন এক আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হতে যাচ্ছে ভাবতেই কেমন লাগছে।

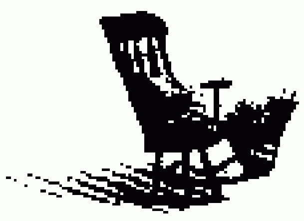

পৃথু কাঁদছে।

শামসুদ্দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছেলেটার কান্না শুনছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বেচারা কান্না বন্ধ করার চেষ্টা করছে, পারছে না। নিশ্চয়ই কোনো কঠিন শাস্তির ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হচ্ছে। শামসুদ্দিনের ইচ্ছা করছে ছেলেটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। সকালে ঘুম ভাঙবে বাচ্চা একটা ছেলের কান্নায় এটা কেমন কথা ? রাহেলাকে কি বুঝিয়ে ব্যাপারটা বলা যায় ?

শামসুদ্দিন উঠে বসেছেন। কী করবেন মনস্থির করতে পারছেন না। রফিক বাসায় আছে। তার কথা শোনা যাচ্ছে। ছেলের মহাবিপদ হলে সে এগিয়ে যাবে, কাজেই তাঁকে খুব বেশি চিন্তিত না হলেও হবে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন, আটটা পাঁচ। অনেক বেলা হয়ে গেছে। অন্যদিন ভোর ছ'টার আগেই তাঁর ঘুম ভাঙে। আজ আটটা পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়েছেন। গত রাতে ঘুম ভালো হয়েছে। শরীর প্রফুল্ল। শুধু পৃথুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার কারণে মনটা খারাপ হয়ে আছে। এমন কোনো দোয়া কি আছে যা পড়লে মায়ের মনে শিশুদের প্রতি করুণা জাগে ?

ভাইজানের ঘুম ভেঙেছে ?

শামসুদ্দিন দেখলেন হাসিমুখে রফিক ঢুকেছে। তার হাতে ট্রে। ট্রেতে দু'কাপ চা। একটা পিরিচে দু'টা টোস্ট বিস্কিট। এক গ্লাস পানি। রফিক টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, বেড-টি এনেছি।

শামসুদ্দিন বললেন, এখনো মুখ ধোয়া হয় নি।

রফিক হাসতে হাসতে বলল, বেড-টি বাসিমুখে খেতে হয়। বিদেশে যাচ্ছেন বেড-টি খেতে হবে। এখন থেকে প্র্যাকটিস করুন। খুব বেশি অস্বস্তি লাগলে কুলি করে নিন। বাসিমুখে চা খেতে পারবেন না ভেবেই পানি নিয়ে এসেছি। বেড-টি খাওয়ার নিয়ম অবশ্যি তা না। প্রথম যে জিনিসটা মুখে ঢুকবে সেটা হচ্ছে গরম চা, কিংবা গরম কফি। গরম পানিতে মুখের ময়লা ধুয়ে স্টমাকে চলে যাবে। মুখ হবে ক্লিন।

শামসুদ্দিন বললেন, পৃথু কাঁদছে কেন ?

রফিক বলল, তাকে নাঙ্গু বাবা করা হয়েছে, এই জন্যে কাঁদছে।

নাঙ্গু বাবা মানে কী ?

আবার বিছানা ভিজিয়েছে বলে রাহেলা তাকে শাস্তি দিয়েছে। পৃথু আজ সারাদিন কোনো প্যান্ট পরতে পারবে না। নেংটো হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। পৃথু কাঁদছে লজ্জায়।

শামসুদ্দিন মন খারাপ করে বললেন, বাচ্চা একটা ছেলেকে এটা কেমন শাস্তি ?

রফিক বলল, আপনি আরাম করে চা-টা খান তো ভাইজান! আমি পৃথুকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করব। রাহেলার মেজাজ আজ অতিরিক্ত খারাপ, এই জন্যে তাকে ঘাটাচ্ছি না। মেজাজ নামুক।

শামসুদ্দিন চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। পৃথুর ফুঁপিয়ে কান্নাটা মন থেকে দূর করতে পারছেন না।

রফিক বলল, চা-টা ভালো হয়েছে ভাইজান ? আমি বানিয়েছি।

ভালো হয়েছে।

আজ এক কৌটা কফি কিনে আনব। কফি খাওয়ার অভ্যাস হওয়া দরকার। আমেরিকায় শুনেছি সবাই কফি খায়। চায়ের চল নেই। বৃটিশরা চা ভক্ত।

কফি আনতে হবে না রফিক।

ভাইজান, যাবার তারিখ কি ঠিক হয়েছে ?

খুব সম্ভব আগামী মাসের ৭ তারিখে যাব। জয়নাল ছেলেটা সে-রকমই ঠিক করেছে।

জয়নালের সঙ্গে এখনো ঝুলে আছেন ? বললাম না এই ছেলের কাছ থেকে দূরে থাকতে! আমেরিকায় পৌঁছেই এই ছেলে আপনার ডলার নিয়ে কেটে পড়বে।

ছেলেটা ভালো।

আপনার কাছে তো সবই ভালো। আমার সাবধান করে দেবার কথা, সাবধান করে দিলাম। আগামী মাসের সাত তারিখে চলে যাবেন, হাতে তো তাহলে সময় একেবারেই নেই। আপনার কী কী খেতে ইচ্ছা করে দয়া করে বলবেন। ব্যবস্থা করব।

শামসুদ্দিন বললেন, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমি মারা যাচ্ছি। মৃত্যুর আগে প্রিয় খাবারগুলি খেতে হবে।

সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হচ্ছেন। দেশী খাওয়া-খাদ্য কতদিন পাবেন

না। কচুর লতি, মলা মাছ, উচ্ছে ভাজি, মাষকলাইয়ের ডাল— আমেরিকায় এইসব পাবেন না।

আমার খাওয়া নিয়ে তুমি মোটেই চিন্তা করবে না। তুমি রাহেলার দিকে একটু নজর দাও। ইদানীং তার মেজাজ এত খারাপ হয়েছে!

রফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, মেজাজ আসলেই বেশি খারাপ হয়েছে। পেটের সন্তান খালাস না হওয়া পর্যন্ত মেজাজ ঠিক হবে না। পৃথু যখন পেটে ছিল তখনো এরকম মেজাজ খারাপ থাকত। একবার তো ছাদে গিয়ে উঠল— তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়বে এরকম প্ল্যান। আমি হাতে পায়ে ধরে নামিয়ে এনেছিলাম। একেক মেয়ের একেক নেচার।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললে হয় না?

কথা বলেছি। ডাক্তার বলেছে এটা এমন কিছু না। হরমোনাল ইমব্যালান্স থেকে এরকম হয়। ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে বলেছে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খুশি রাখার চেষ্টা করতে। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রাহেলা যাই বলছে আমি তাতেই সায় দিচ্ছি। রাহেলা বলল, বিছানা ভিজানোর শাস্তি হিসেবে পৃথু সারাদিন প্যান্ট ছাড়া থাকবে। আমি বলেছি, অবশ্যই তাই থাকবে। ভাইজান কি চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খাবেন?

শামসুদ্দিন সিগারেট নিলেন। রফিক সিগারেট ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, রাহেলাকে খুশি করার আরেকটা বুদ্ধি বের করেছি ভাইজান!

কী বুদ্ধি?

ভালো সেন্ট ওর পছন্দ। ভালো সেন্টের এমন দাম, কিনে দেওয়া সম্ভব না। তারপরও দু' বোতল সেন্ট কিনে এনেছি। সেন্ট পেলে সে এক সপ্তাহ খুশি থাকবে। ফুস ফুস করে গায়ে সেন্ট ছাড়বে আর হাসবে।

রাহেলার সেন্ট এত পছন্দ জানতাম না তো!

খুবই পছন্দ। মাঝে মাঝে যখন দোকানে নিয়ে যাই ও কী করে জানেন? দুনিয়ার সেন্ট নেড়ে-চেড়ে দেখে। হাতে স্প্রে করে। গন্ধ শোঁকে। তখন তাকে দেখলে আপনার মনে হবে সে জগতের সুখী মহিলাদের একজন।

বলো কী!

রফিক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সেন্টের শিশি দু'টা আমি আপনার ড্রয়ারে রেখে দিচ্ছি ভাইজান। এক সময় তাকে ডেকে বলে দেবেন যে আপনি তার জন্যে কিনে এনেছেন। আপনার কাছ থেকে সেন্ট পেলে সে অনেক বেশি খুশি হবে।

শামসুদ্দিন তাকিয়ে রইলেন। সেন্টের শিশি তিনি দিলে রাহেলা বেশি খুশি হবে কেন ঠিক ধরতে পারছেন না।

রফিক বলল, আমার উপরে সে নানান কারণে রেগে আছে। আমি যদি দিই তাতে লাভ হবে না। হয়তো ছুড়ে ফেলে দেবে। দামি একটা জিনিস নষ্ট হবে।

শামসুদ্দিন বললেন, আমি সেন্টের শিশি দিয়ে তাকে কী বলব ?

বলবেন আপনি তার জন্যে কিনেছেন।

মিথ্যা কথা বলা হবে তো।

সংসারে থাকতে হলে দু'একটা মিথ্যা কথা বলতে হয় ভাইজান। এতে দোষ হয় না। তারপরও আপনার যদি খারাপ লাগে আপনি আমাকে টাকা দিয়ে দেবেন। নেন, আরেকটা সিগারেট নেন। দেশে যেমন যে-কোনো জায়গায় আরাম করে সিগারেট ধরাতে পারবেন, আমেরিকায় পারবেন না। স্মোকিং ওরা দেশ থেকে তুলে দিচ্ছে। খুব হেলথ কনশাস জাতি।

শামসুদ্দিন আরেকটা সিগারেট ধরালেন। পৃথুর ফোঁপানি শোনা যাচ্ছে না। তিনি এতে স্বস্তি পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে তার উপর দিয়ে ঝড় যা যাবার চলে গেছে। বাচ্চাটা আজকের মতো রেহাই পেয়েছে। শামসুদ্দিন মনে মনে ঠিক করে ফেললেন আজ বিকেলে পৃথুকে নিয়ে বের হবেন। তার পছন্দের কোনো খেলনা কিনে দেবেন। একটা কোন-আইসক্রিম কিনে দেবেন। বাবার হাত ধরে আইসক্রিম খেতে খেতে বাচ্চা একটা ছেলে গুট গুট করে এগুচ্ছে। কী সুন্দর দৃশ্য। পৃথুর মতো একটা ছেলে যদি তাঁর থাকত!

পৃথু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তার খুবই লজ্জা লাগছে, কারণ তার পরনে প্যান্ট নেই। তার গায়ে হালকা গোলাপি রঙের একটা হাফশার্ট। শার্টের ঝুল এমন যে তার লজ্জা ঢাকা পড়ে। ঘরের ভেতর শুধু শার্ট পরে থাকতে হচ্ছে এই লজ্জাতেই সে মরে যাচ্ছে। লজ্জার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভয়, কারণ মা একটু আগে বলেছে পৃথুকে এইভাবেই কাল স্কুলে যেতে হবে। মা এত নিষ্ঠুর আচরণ করবে বলে পৃথুর মনে হয় না। তবে করতেও পারে। রেগে গেলে মা নিষ্ঠুর আচরণ করে। সত্যি সত্যি তাকে যদি কাল এইভাবে স্কুলে যেতে হয় তাহলে কী হবে! সবাই তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। হাসাহাসি করবে। ক্লাসের টিচার বলবে—এই পৃথু, ছিঃ ছিঃ তুমি নেংটো হয়ে স্কুলে এসেছ কেন ?

মা'র রাগ কি এর মধ্যে পড়বে না ? অবশ্যই পড়বে। পৃথু মনে মনে বলল, আল্লাহ, মায়ের রাগ কমিয়ে দাও। গত শবেবরাতে মায়ের রাগ কমাবার কথাটা

আল্লাহকে বলা দরকার ছিল। শবেবরাতে সে আল্লাহ্র কাছে অনেক কিছু চেয়েছে— শুধু এই জিনিসটা চাইতে ভুলে গেছে। বিরাট ভুল হয়েছে। শবেবরাতে সে আল্লাহর কাছে যে সব জিনিস চেয়েছে তার মধ্যে আছে—

একটা ফুটবল (পাম্পারসহ)

একটা পেনসিল বক্স	:	(ডোনাল্ড ডাকের ছবিওয়ালা। তাদের ক্লাসের একটা মেয়ের আছে। মেয়েটির নাম অমি। মেয়েটা খুব ভালো।)
বেনানা ইরেজার	:	(কলার মতো দেখতে ইরেজার। ইরেজারটার গায়ে পাকা কলার গন্ধ। মুস্তাক নামের একটা ছেলের আছে। ছেলেটা খুবই দুষ্ট। সবার সঙ্গে মারামারি করে।)
তালাচাবি দেয়া খাতা	:	(চাবি দিয়ে রাখলে এই খাতা খোলা যায় না। শান্তনুর এরকম খাতা আছে। শান্তনু হিন্দু। তার কোনোদিন মুসলমানি হবে না।)
দুই পকেটওয়ালা ফুলপ্যান্ট	:	(তাদের ক্লাসের সিরাজের এরকম প্যান্ট আছে। অনেকগুলি পকেট। প্যান্টের হাঁটুর কাছে জিপার আছে। জিপার খুললে ফুলপ্যান্টটা হাফপ্যান্ট হয়ে যায়।)
একটা পাজেরো জিপগাড়ি	:	(তাদের ক্লাসের মীরা নামের মেয়েটা এরকম গাড়িতে করে আসে। তাদের গাড়ির রঙ কালো। পৃথু আল্লাহর কাছে লাল রঙের গাড়ি চেয়েছে। মীরা মেয়েটাকে পৃথুর খুবই ভালো লাগে। পৃথু ঠিক করেছে সে কোনোদিন বিয়ে করবে না। তারপরও তাকে যদি বিয়ে করতেই হয় তাহলে সে মীরাকেই বিয়ে করবে। মীরা পৃথুকে পৃথু ডাকে না। ডাকে পৃথিবী। এটাও পৃথুর খুব ভালো লাগে। নাম বদলাবার কোনো ব্যবস্থা থাকলে সে নিজের নাম বদলে পৃথিবী রাখত। মনে হয় এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই।)

অনেকক্ষণ হলো দরজার আড়ালে পৃথু দাঁড়িয়ে আছে। তার পানির পিপাসা পেয়েছে, কিন্তু পানি খাবার জন্যে দরজার আড়াল থেকে বের হবার সাহস পাচ্ছে না। মা খাটে বসে আছেন। বের হলেই সে সরাসরি মায়ের সামনে পড়ে যাবে।

পৃথুর কাছে আলাউদ্দিনের দৈত্যের চেরাগটা থাকলে দৈত্যকে বলত এক গ্লাস পানি এনে দিতে। আলাউদ্দিনের দৈত্যের চেরাগ যাদের কাছে আছে তারা কতই না সুখী।

পৃথু!

রাহেলার কঠিন গলা শুনে পৃথু শক্ত হয়ে গেল। কান্নাটা থেমে গিয়েছিল, আবার তা ফিরে আসছে বলে মনে হলো। গলার কাছে শক্ত হয়ে গেছে। এটা কান্না আসার লক্ষণ।

কথা বলছ না কেন, পৃথু ?

কী মা!

দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে আস।

পৃথু দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। রাহেলা চাপা-গলায় বলল, কাল এইভাবেই স্কুলে যাবে। মনে থাকবে ?

পৃথু হাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

স্কুলের সবাই যখন জিজ্ঞেস করবে এই অবস্থা কেন ? তখন বলবে আমি প্রতিরাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেলি এই জন্যে এটা আমার শাস্তি। বলতে পারবে না ?

পৃথু আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

এখন আমার সামনে থেকে যাও। আমার মাথা ধরেছে, আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকব। খবরদার! প্যান্ট পরবে না। যেভাবে তোমাকে থাকতে বলেছি সেইভাবে থাকবে।

পৃথু আবারো মাথা নাড়ল। সে এক হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে আছে। কারণ তার কান্না এসে যাচ্ছে, কান্নাটা আটকানো দরকার। পৃথু চুপিচুপি শামসুদ্দিন সাহেবের ঘরের খাটের নিচে চলে গেল। খাটের নিচে লুকিয়ে বসে থাকলে কেউ তার এই অবস্থাটা দেখবে না।

শামসুদ্দিন দেখে ফেললেন। তিনি পৃথুকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। নিজের একটা লুঙ্গি ছোট করে পৃথুকে পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। পৃথু ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করছেন না। এটাও পৃথুর খুব ভালো লাগছে। শান্তি শান্তি লাগছে। ঘুম এসে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে সে হয়তো এই বিছানাও ভিজিয়ে দেবে। তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। বড় মামা তাকে কিছুই বলবেন না। কাউকে জানাবেনও না। বড় মামার বিছানা সে আগেও কয়েকবার ভিজিয়েছে। বড় মামা প্রতিবারই বলেছেন, কাণ্ড

দেখেছিস পৃথু! রাতে পানি খাবার সময় বিছানায় পানি ফেলে দিয়েছি। মনে হয় তোর প্যান্টও ভিজিয়ে ফেলেছি। যা, তাড়াতাড়ি প্যান্ট বদলে আয়।

পৃথু!

জি বড় মামা।

আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি ?

কোথায় ?

পার্কে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব, তারপর যাব দোকানে। তুই যদি কিছু কিনতে চাস কিনে দেব।

আচ্ছা।

বড় মামা এখনো পিঠে হাত বুলাচ্ছেন। কী যে আরাম লাগছে! কারো কারো হাতে খুব মায়া থাকে। গায়ে হাত বুলালেই মায়ায় শরীর ভরে যায়। পৃথু ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই রাহেলা ছেলের খোঁজে ঘরে ঢুকল। শামসুদ্দিন বললেন, ওকে ডাকিস না। ঘুমাচ্ছে। সামান্য জ্বরও মনে হয় এসেছে। গা গরম।

রাহেলা বলল, ও যে আমাকে কী যন্ত্রণা করছে ভাইজান! একটাতেই এই অবস্থা, দু'নম্বরটা আসলে কী যে হবে!

শামসুদ্দিন বললেন, তুই এই চেয়ারটায় বোস।

রাহেলা বিস্মিত হয়ে বলল, কেন ? কিছু বলবে ? পৃথুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি এটা নিয়ে উপদেশমূলক কথা বলবে ?

না। আমি কখনো কাউকে উপদেশ দিই না। তুই আরাম করে বোস।

রাহেলা বসল। শামসুদ্দিন টেবিলের ড্রয়ার খুলতে খুলতে বললেন, তোর জন্যে সামান্য উপহার এনেছি। এই নে।

রাহেলা থমথমে গলায় বলল, এইগুলো কখন কিনেছ ?

কখন কিনেছি এটা দিয়ে তোর দরকার কী ?

দরকার আছে। আমার ধারণা তুমি সেন্টের বোতল দু'টা গত পরশু কিনেছ।

আমার মনে নেই, হতে পারে।

হতে পারে-টারে না। অবশ্যই তুমি গত পরশু কিনেছ। কীভাবে বুঝলাম সেটাও তোমাকে বলি। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, তারপরও বলি— আমি স্বপ্নে দেখেছি।

শামসুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, স্বপ্নে দেখেছিস ?

হুঁ, পরশু রাতে স্বপ্নে দেখেছি। কী স্বপ্ন সেটা তোমাকে বলা ঠিক হবে না।

বলা ঠিক না হলে বলতে হবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে, কী স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে বলি। না বললে শান্তি পাব না। আমার কোনো স্বপ্ন ফলে না। এটা কীভাবে ফলল কে জানে। খুবই অবাক লাগছে। ভাইজান, দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। চোখে দেখে গায়ের কাঁটা বোঝা যাবে না। হাত দিয়ে দেখ। আমার গায়ে হাত রাখলে তোমার হাত পচে যাবে না। আমার এইডস হয় নি।

তোর গায়ে যে কাঁটা দিয়েছে এটা খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি। এখন স্বপ্নটা কী বল।

স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমার সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছি। দু'জন হাঁটছি। রাস্তার দু'পাশে বিশাল বড় বড় দোকান। একেকটা দোকান এত বড় যে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে খুব শব্দ হচ্ছে। একটু পরপর মাথার উপর দিয়ে জেট প্লেন উড়ে যাচ্ছে। আমার খুবই ভয় লাগছে। তুমি বললে, আয় একটা দোকানে ঢুকে দেখি এদের দোকানগুলো কেমন। আমি তোমার সঙ্গে দোকানে ঢুকলাম। দোকানটা হলো পারফিউমের। রাজ্যের পারফিউম। কেনার সাধ্যও নাই, এত দাম। দোকানের একজন সেলসগার্ল আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, আপনারা কি প্রথম আমাদের দোকানে এসেছেন ? তুমি বললে, হ্যাঁ। সেলসগার্ল বলল, প্রথম যারা আমাদের দোকানে আসে তাদেরকে একটা করে ফ্রি পারফিউম দিই। তোমরা দু'জন তোমাদের পছন্দমতো দু'টা পারফিউম বেছে নাও। তখন আমি ছুটে গিয়ে দু'টা বেছে নিয়ে নিলাম। আমারটাও নিলাম। তোমারটাও নিলাম। এই হলো স্বপ্ন। অদ্ভুত স্বপ্ন না ভাইজান ?

হুঁ।

ভাইজান শোন, তুমি যে আমাকে দু'টা পারফিউম কিনে দিয়েছ এটা পৃথুর বাবাকে জানিও না।

কেন ?

সে অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। কী দরকার!

অন্য কিছু ভাববে কেন ?

ভাবলে আমি কী করব ? আমি তো আর অন্যের ভাবনা কনট্রোল করতে পারি না। এই বিষয়ে তুমি পৃথুর বাবার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না।

আচ্ছা।

রাহেলা চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে চাপা গলায় বলল, এত কিছু থাকতে তুমি বেছে বেছে আমার জন্যে পারফিউম কেন কিনেছ বলো তো ? আচ্ছা থাক, বলতে হবে না। আমি জানি কেন কিনেছ।

শামসুদ্দিন দেখলেন রাহেলার চোখ চকচক করছে। সে মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে। শামসুদ্দিনের মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

পৃথুকে দোকানে নিয়ে গিয়ে শামসুদ্দিন একটা ফুটবল কিনে দিলেন। পৃথু হতভম্ব হয়ে গেল। শবেবরাতে আল্লাহর কাছে তো সে ফুটবলই চেয়েছিল। যা সে চেয়েছিল তাই তো পাচ্ছে। তবে ফুটবলের সঙ্গে সে একটা পাম্পারও চেয়েছিল। পাম্পারটা পাওয়া যায় নি।

শামসুদ্দিন বললেন, আর কী লাগবে বল।

পৃথু লজ্জিত গলায় বলল, আর কিছু লাগবে না।

লজ্জা করিস না, বল।

একটা পেনসিল-বক্স কিনব— ডোনাল ডাকের ছবিওয়ালা।

এই দোকানে সে-রকম পেনসিল-বক্স ছিল না। শামসুদ্দিন চার-পাঁচটা দোকান ঘুরে পৃথুর পছন্দের পেনসিল-বক্স কিনলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, বেন্যানা ইরেজারও পাওয়া গেল। শামসুদ্দিন বললেন, আয় তোকে লাল টুকটুক একটা গেঞ্জি কিনে দিই।

গেঞ্জি কিনব না মামা। ফুলপ্যান্ট কিনব। হাঁটুর কাছে জিপার থাকে। জিপার খুললে ফুলপ্যান্টটা হাফপ্যান্ট হয়ে যায়।

কোথায় পাওয়া যায়?

কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি না।

আয় খুঁজতে থাকি। কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তুই টায়ার্ড না তো?

না।

বিশেষ ধরনের প্যান্ট শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। পৃথুর এত অবাক লাগছে! শবেবরাতে আল্লাহর কাছে যা যা চাওয়া হয়েছে সবই পাওয়া গেছে, শুধু লাল রঙের পাজেরো জিপটা এখনো পাওয়া যায় নি। তবে পাওয়া নিশ্চয়ই যাবে।

রাতে ঘুমোতে যাবার সময় রফিক বলল, রাহেলা তুমি কি গায়ে সেন্ট মেখেছ নাকি? মিষ্টি গন্ধ আসছে।

রাহেলা বলল, গা থেকে মিষ্টি গন্ধ এলে কি তোমার ঘুমের অসুবিধা হবে? অসুবিধা হলে গরম পানি দিয়ে গোসল করে আসি।

রফিক বলল, খুবই মিষ্টি গন্ধ। সেন্ট কবে কিনলে ? নাকি কেউ উপহার দিয়েছে ?

এত কিছু বলতে পারব না। গন্ধটা ভালো লাগছে ?

হ্যাঁ।

আমার কাছে আরেকটা সেন্ট আছে, সেটার গন্ধ এটার চেয়েও ভালো।

বলো কী!

দু'টা সেন্টই আমাকে একজন উপহার দিয়েছে।

কে দিয়েছে ? ভাইজান দিয়েছেন নাকি ?

ভাইজান আমাকে সেন্ট দেবেন কেন ? আমি কি ভাইজানের প্রেমিকা ? হুট করে তুমি ভাইজানকে সন্দেহ করে ফেললে। তোমার লজ্জাও করল না ? খালাতো ভাই হলেও তো সে ভাই।

সরি।

সেন্ট দু'টা আমি নিজের টাকায় কিনেছি। কিছু প্রাইজবন্ড ছিল। প্রাইজবন্ড বিক্রি করে কিনেছি।

ভালো করেছ।

রাহেলা বিছানায় উঠে বসে উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমার ঐ সেন্টের গন্ধটা শুঁকে দেখতে চাও ?

রফিক বলল, অবশ্যই চাই। এক কাজ কর, আমার শার্টে খানিকটা স্প্রে করে দাও।

বোকার মতো কথা বলবে না, মেয়েদের সেন্ট তোমার গায়ে স্প্রে করব কেন ? এত দামী একটা জিনিস খামাখা নষ্ট হবে।

তাহলে থাক।

রাহেলা সেন্টের শিশি বের করে নিয়ে এলো এবং রফিককে বিস্মিত করে তার শার্টে স্প্রে করে দিল। অনেক অনেক দিন পর রাহেলা ঘুমুতে যাবার সময় স্বামীর গায়ে হাত রাখল।

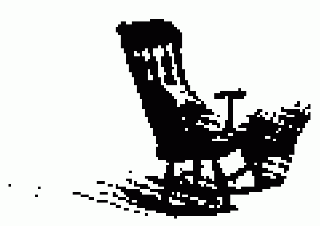

দুঃস্বপ্ন দেখে জয়নালের ঘুম ভেঙেছে। সে বিছানায় জবুথবু হয়ে বসে আছে। টিনের চালে ঝুম বৃষ্টি পড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। ব্যাঙ ডাকছে। রীতিমতো বর্ষা-পরিবেশ।

জয়নাল ঘড়ি দেখল, তিনটা সাত বাজে। পানি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়া যায়। গায়ে চাদর দিয়ে শুয়ে পড়লে আরামের ঘুম হবে। তার ঘুমোতে যেতে ইচ্ছা করছে না। বরং বৃষ্টির শব্দ শুনতে ইচ্ছা করছে। আমেরিকায় টিনের চালের বৃষ্টি, বৃষ্টির সঙ্গে ব্যাঙের ডাক শোনা যাবে না। একেকটা দেশ একেক রকম। বাংলাদেশ বৃষ্টির দেশ। সকালের বৃষ্টি এক রকম, দুপুরের বৃষ্টি আরেক রকম, আবার নিশিরাতের বৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্যরকম। একটা ক্যাসেটে বৃষ্টির শব্দ রেকর্ড করে নিয়ে গেলে কেমন হয়? আমেরিকায় পৌঁছানোর পর দেশের জন্যে যদি খুব মন খারাপ লাগে তাহলে ক্যাসেট বাজিয়ে শোনা হবে। ঘটনাটা হয়তো এরকম ঘটবে— সে এবং ইতি ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে রকিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে। দু'জনের হাতেই কফির মগ। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারণ বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্যের অনেক নিচে। তবে ঘরের ভেতরে ফায়ারপ্লেসের কারণে আরামদায়ক উষ্ণতা। সেই উষ্ণতায় আরামে হাত-পা ছেড়ে তারা দুজন শুনছে বাংলাদেশের বৃষ্টির ক্যাসেট-করা শব্দ। জয়নাল ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা যাওয়া হবে তো?

দুঃস্বপ্নটা না যাওয়া বিষয়ক। স্বপ্নের শুরুটা ছিল সুন্দর। শুরুটা সুখ-স্বপ্নের। কিছুদূর গিয়েই সুখ-স্বপ্নটা হঠাৎ এবাউট টার্ন করে দুঃস্বপ্ন হয়ে যায়। স্বপ্নের শুরুতে দেখা যায় তারা তিনজন আমেরিকায় যাবার জন্যে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়েছে। সে, শামসুদ্দিন সাহেব এবং ইতি। মালপত্র মাইক্রোবাসে তোলা হচ্ছে। শামসুদ্দিন সাহেব ইতিকে 'বৌমা বৌমা' বলে ডাকছেন। মাইক্রোবাসে উঠে শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, বৌমা, একটা পান খাওয়াও তো দেখি, বাংলাদেশে শেষ পানটা খেয়ে যাই। ইতি তাঁকে একটা পান দিল। তখন জয়নাল বলল, দেখি আমাকেও একটা পান দাও। ইতি পান বানিয়ে জয়নালের হাতে না দিয়ে সরাসরি মুখে ঢুকিয়ে দিল। খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার। শামসুদ্দিন সাহেব

আড়চোখে ঘটনাটা দেখলেন। মাইক্রোবাসের ড্রাইভারও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। স্বপ্নটা এই পর্যন্ত সুখ-স্বপ্ন। এয়ারপোর্ট পৌঁছেই স্বপ্নটা হয়ে গেল দুঃস্বপ্ন। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। শামসুদ্দিন সাহেব এবং ইতি ইমিগ্রেশন পার হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ইমিগ্রেশনের লোকজন জয়নালকে আটকে রাখল। দাড়িওয়ালা একজন ইমিগ্রেশন অফিসার (যার মুখটা জয়নালের খুবই পরিচিত, কিন্তু পরিচয়টা কিছুতেই মনে আসছে না) বারবার জয়নালের পাসপোর্টের পাতা উল্টাচ্ছেন আর জয়নালের দিকে কঠিন চোখে তাকাচ্ছেন। সব যাত্রী পার হয়ে যাচ্ছে। বিমান থেকে বারবার প্লেনে উঠার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। অধৈর্য হয়ে জয়নাল বলল, স্যার, একটু তাড়াতাড়ি করুন। প্লেন ছেড়ে দিচ্ছে। ইমিগ্রেশন অফিসার বললেন, তাড়াতাড়ি করব কীভাবে, আপনার পাসপোর্টে তো ভিসার সিল নেই। জয়নাল বলল, এটা আপনি কী বলছেন ? দেখি পাসপোর্টটা! ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্টটা জয়নালের হাতে দিলেন। জয়নাল পাতা উল্টিয়ে দেখে পাসপোর্টের সবগুলো পাতা খালি, কোথাও কোনো লেখা নেই। শুধু শেষ পাতায় canceled সিল মারা।

দুঃস্বপ্নের এই জায়গায় জয়নালের ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙার পরপরই দাড়িওয়ালা ইমিগ্রেশন অফিসারকে সে চিনতে পারল। ভদ্রলোক তাঁর ছোটচাচা। দুঃস্বপ্নে তিনি ইমিগ্রেশন অফিসার হয়ে ধরা দিয়েছেন। ইতির উপদেশমতো কাজ করায় কিছুটা লাভ হয়েছে। ছোটচাচা আট হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। এবং লিখে পাঠিয়েছেন তাঁর হাত একেবারেই খালি। এই টাকাটা তিনি হাওলাত করে পাঠিয়েছেন।

জয়নালের এখন সম্বল হলো সর্বমোট সাড়ে তেরো হাজার টাকা। এই টাকার অনেকটাই এনগেজমেন্টের জিনিসপত্র কেনায় খরচ হয়েছে।

শাড়ি (হালকা সবুজ)	২,১০০ টাকা (জামদানি)
শাড়ি (সুতি)	৪০০ টাকা
আংটি	২,০০০ টাকা
মিষ্টি (এখনো কেনা হয় নি)	৫০০ টাকা (৪ কেজি)
মোট	৫,০০০ টাকা

বকেয়া তিন মাসের বাড়িভাড়া বাবদ দিতে হবে চার হাজার পাঁচশ টাকা। নয় হাজার পাঁচশ চলে গেল। হাতে থাকল চার হাজার। এনগেজমেন্টের দিনে যদি সত্যি সত্যিই বিয়ে হয়ে যায় তাহলে বাড়তি টাকা কিছু তো লাগবেই।

টিকিটের টাকা পুরোটাই বাকি। শুধু একটা টিকিট হাতে নিয়ে তো আমেরিকায় যাওয়া যায় না। অন্তত এক মাস নিজে নিজে চলার মতো ব্যবস্থা থাকা দরকার। জয়নালের কিছু বন্ধুবান্ধব বিদেশে চলে গেছে। তাদের কারোর ঠিকানা-ই জয়নালের কাছে নেই। ঠিকানা থাকলে তাদেরকে লেখা যেত। তার ছোটবেলার বন্ধু বরকত ছিল মালয়েশিয়াতে। সেখানে কাগজপত্র না থাকায় কিছুদিন জেলও খেটেছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এই খবর জয়নালের কাছে আছে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সে কোথায়, কেউ জানে না। উড়া খবর— সে এখন জাপানে। ইমরান আছে জার্মানিতে। ইমরানকে জয়নাল চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠি ইমরানের কাছে নিশ্চয়ই পৌছায় নি। পুলিশের ভয়ে ইমরান দু'দিন পরপর ঠিকানা বদলায়। ভালো ভালো ছেলে বিদেশে গিয়ে চোরের জীবন যাপন করছে। কী আফসোস!

ব্যাংক কি এই ব্যাপারে লোন দেবে ? ব্যাংকের তো উচিত লোন দেয়া। নানান দুঃখ ধান্দা করে ছেলেরা বিদেশে যাচ্ছে— এদেরকে কি একটু সাহায্য করা উচিত না ? এই ছেলেরাই তো বিদেশ থেকে এক সময় অতি মূল্যবান ফরেন কারেন্সি পাঠাতে শুরু করবে। দেশেরই তাতে লাভ।

দেশে অনেক পয়সাওয়ালা লোক আছে। এরা স্কুল-কলেজ বানায়, মাদ্রাসা বানায়, এতিমখানা খোলে। তাদের কাছে কি সাহায্য চাওয়া যায় না ?

বৃষ্টি থেমে গেছে। জয়নাল বিছানা থেকে নেমে কেরোসিনের চুলা ধরাল। চায়ের পিপাসা পেয়েছে। সিগারেট দিয়ে গরম এক কাপ চা খাবে। মন থেকে সব দুশ্চিন্তা আপাতত ঝেড়ে ফেলতে হবে। আগামীকাল সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সে কোনো দুশ্চিন্তা করবে না। আগামীকাল রাতে তার এনগেজমেন্ট। ইতি যেভাবে বলেছে তাতে মনে হয় এনগেজমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে কাজি ডাকিয়ে বিয়েও পড়ানো হয়ে যাবে। সে-রকম কিছু হলে আগামীকাল তার বিয়ে। জীবনের তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিনের একটি। একটা মোবাইল টেলিফোন যদি তার কাছে থাকত ভালো হতো। টেলিফোনে ইতির সঙ্গে কথা বলা যেত।

ইতি ঘুম-ঘুম চোখে টেলিফোন ধরে বলত— কে ? জয়নাল বলত, আমি এক টেকো-মাথা অধম। তুমি কেমন আছ গো জানপাখি পুটুস-পুটুস ?

উফ্, কী যে আপনার কথা! নাইন টেনে পড়া ছেলেরাও এরকম করে কথা বলে না। পুটুস-পুটুস আবার কী ?

তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আনন্দে হৃৎপিণ্ডে পুটুস-পুটুস শব্দ হচ্ছে, এই জন্যে বলছি পুটুস-পুটুস। কেমন আছ গো পিন-পিন ?

আপনার পায়ে পড়ি, এরকম করে কথা বলবেন না।

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে আপনি করে বলো না। আমাকে যখন আপনি করে বলো তখন নিজেকে অনেক দূরের মানুষ মনে হয়।

আপনি তো দূরেরই মানুষ। যখন কাছের হবেন তখন তুমি বলব। ভালো কথা, কাল যে আমাদের পানচিনি, মনে আছে?

মনে আছে গো ইটি-মিটি।

অনুষ্ঠানটা হবে পানচিনির। সেই অনুষ্ঠানকে বিয়ের অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে। এটা মনে আছে?

মনে আছে গো টুন-টুনাং।

উফরে আল্লাহ্! আপনি কি দয়া করে অং-বং বলা বন্ধ করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন? স্বাভাবিকভাবে কথা না বললে আমি কিন্তু এখন টেলিফোন রেখে দেব।

আচ্ছা যাও, স্বাভাবিকভাবে কথা বলব।

বিয়ের পর আমি যে আপনার গুহায় থাকতে যাব সেটা কি মনে আছে?

খাইছে রে আমারে!

খাইছে রে আমারে আবার কী ধরনের ভাষা! দয়া করে এই ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনি রিকশাওয়ালা না, আর আমিও মাতারী না।

আচ্ছা যাও, আর বলব না। তবে শোন, বিয়ের পর আমার সঙ্গে গুহায় থাকতে আসা ঠিক হবে না। বাথরুম সমস্যা। রাতে বাথরুম পেলে তুমি নিশ্চয়ই দারোয়ানদের বাথরুমে যাবে না?

সেটা আপনি দেখবেন। আমি আমার ইচ্ছার কথা জানালাম। আমি দেখে এসেছি আপনার বিছানার চাদর নোংরা। চাদর ধুইয়ে ইস্ত্রি করিয়ে আনবেন।

ইয়েস ম্যাডাম।

ঘর ফিনাইল দিয়ে মুছবেন।

ওকি-ডকি!

ওকি-ডকি আবার কী?

আমেরিকান স্ল্যাং। আমরা যেমন বলি Ok, আমেরিকানরা বলে ওকি-ডকি।

আমার সঙ্গে আমেরিকান স্ল্যাং বলবেন না।

ইয়েস ম্যাডাম।

আমাকে ম্যাডামও ডাকবেন না।

ইয়েস ইতি।

আমার সঙ্গে আহ্লাদীও করবেন না। বিয়ের আগে আহ্লাদী করা যায়। বিয়ের পর না।

ই ই।

ই ই টা আবার কী?

ই ই হলো ইয়েস ইতি।

বানিয়ে বানিয়ে ইতির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে খুব মজা লাগছে। চা-টা খেতে ভালো হয়েছে। আজ একটা বিশেষ রাত— হয়তো বা শেষ ব্যাচেলর রাত। আমেরিকায় এই রাত বিশেষভাবে পালন করা হয়। সারারাত গান বাজনা হৈচৈ ফুর্তি চলে। ওরা ফুর্তিবাজ জাতি। ওদের কাণ্ডকারখানাই অন্যরকম।

দিনটা সুন্দরভাবে শুরু হয়েছে। আকাশে ঝকঝকে রোদ। বাতাস মধুর শীতল। রাতে বৃষ্টি পাওয়ায় গাছপালার পাতা চকচক করছে। ধূলি-শূন্য শহর। জয়নাল ঠিক করে রেখেছে মন খারাপ হবার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে এরকম কোনো কাজ সে করবে না। আজ তার জীবনের একটি বিশেষ দিন। ইতি নামের অসাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে তার এনগেজমেন্ট। বিয়ে হয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। মন খারাপ হতে পারে এমন কোনো ঘটনা ঘটিয়ে আজকের দিনটা সে নষ্ট হতে দিতে পারে না।

দুপুর পর্যন্ত জয়নাল নিজের ঘরে বসে রইল। বিয়ের দিন বর-কনে দু'জনকেই ঘরে বন্দি থাকতে হয়। রাস্তায় বের হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাস্তায় বের হলে একসিডেন্ট হতে পারে। কোনোরকম রিস্ক নেওয়া যাবে না।

ডাকে তিনটা চিঠি এসেছে। জয়নাল চিঠিগুলো পড়ল না। চিঠিতে মন খারাপ হবার মতো কিছু থাকতে পারে। মন ভালো হয়ে যেতে পারে এমন চিঠি জয়নালকে অনেকদিন কেউ লিখে নি। বেছে বেছে আজকের দিনে লিখবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। চিঠি মানেই দুঃসংবাদ। আজকের দিনটা থাকুক দুঃসংবাদের ঊর্ধ্বে।

দুপুরে জয়নাল হোটেল থেকে খাবার এনে খেল। চুলা ধরিয়ে নিজে রান্না করল না। বিয়ের আগের দিন মেয়েদের রান্না করতে দেয়া হয় না। মেয়েদের জন্য যে নিয়ম ছেলেদের জন্যেও তো সেই নিয়মই হওয়া উচিত।

ইতিদের বাড়িতে যাবার কথা সন্ধ্যাবেলা। মাগরেবের পর। শামসুদ্দিন সাহেবকে খবর দেয়া আছে। সন্ধ্যা ছ'টার সময় সে শামসুদ্দিন সাহেবের বাসায় চলে যাবে। সাড়ে ছ'টার দিকে বের হবে। সঙ্গে গাড়ি থাকলে ভালো হতো। কনের বাড়িতে বর যাবে বেবিটেক্সিতে, ভাবতেই যেন কেমন লাগে। যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে তারও মানসম্মানের ব্যাপার আছে। জয়নাল ভেবেছিল তিন-চার ঘণ্টার জন্যে একটা প্রাইভেট কার বা মাইক্রোবাস ভাড়া করবে। সেটা সম্ভব হয় নি।

দু'হাজার টাকা ভাড়া চায়। বেবিটেক্সিতে করে গেলে যেতে আসতে লাগবে আশি টাকা। কোথায় আশি টাকা আর কোথায় দু'হাজার টাকা। কোনো মানে হয় না।

জয়নাল ঘর থেকে বের হলো বিকেল তিনটায়। এত আগে বের হওয়া খুবই বোকামি হয়েছে। একা ঘরে বসে থাকতে মন চাইছে না। এখন সমস্যা হয়েছে সময় কাটানো। শামসুদ্দিন সাহেবের কাছে বিকেল তিনটা থেকে বসে থাকতে লজ্জা লাগছে। তিনি হয়তো মনে মনে ভাববেন— ব্যাটার দেরি সহ্য হচ্ছে না। যাবে মাগরেবের পর— সে এসে বসে আছে দুপুর থেকে।

সময় কাটানোর জন্যে জয়নাল ঢুকে পড়ল 'কার হেভেন' নামের এক গাড়ির দোকানে। সুন্দর সুন্দর ঝকঝকে গাড়ি পড়ে আছে। গাড়িগুলো দেখার মধ্যেও আনন্দ। জয়নাল এমন ভাব করল যেন সে গাড়ি কিনতে এসেছে। আজ ব্যাপারটা খুব হাস্যকর লাগলেও একদিন সে নিশ্চয়ই গাড়ি কিনবে। দোকানের একজন কর্মচারী চোখ সরু করে তাকাচ্ছে। এমন সরু চোখে তাকানোর কিছু নেই। তোমরা গাড়ি সাজিয়ে রেখেছ মানুষকে দেখানোর জন্যেই। জয়নাল প্রাণপণ চেষ্টা করছে এমন একটা ভঙ্গি করতে যেন সে গাড়ি কিনতেই এসেছে। যারা গাড়ি কিনতে আসে তারা নিশ্চয়ই বিশেষ ধরনের কোনো কাপড় পরে আসে না। তার মতোই শার্ট প্যান্ট পরে আসে। কথাও নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের মতোই বলে।

আপনি কী চান?

কর্মচারীর কথা শুনেই জয়নালের গা জ্বলে গেল। কথা বলার ধরন কী? আপনি কী চান?

জয়নাল গম্ভীর গলায় বলল, কিছু চাই না। গাড়ি দেখছি। জীবনে কখনো কাছ থেকে গাড়ি দেখি নি। এখন কাছ থেকে দেখছি। দু'একটা গাড়ি হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখব। কোনো সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে বলুন অন্য কোনো গাড়ির শো-রুমে যাই।

কর্মচারী হকচকিয়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে বিনীত সুর বের করে বলল, স্যার বলুন কী গাড়ি দেখবেন?

আপনাদের কি সবই রি-কন্ডিশনড গাড়ি?

জি স্যার।

নাইনটি নাইন মডেলের নোয়া আছে?

একটা আছে।

দাম কত?

পনেরো লাখ।

নাইনটি নাইন মডেলের নোয়ার দাম তেরো লাখের বেশি হবার পেছনে কোনো যুক্তি আছে ?

গাড়িতে ভিসিডি প্লেয়ার আছে। সিডি আছে। সান রুফ আছে, মুন রুফ আছে। পেছনে সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটার দামই স্যার পড়ে পঞ্চাশ হাজার।

সিঁড়ি তো কোনো কাজের সিঁড়ি না। শো পিস।

জি স্যার, শো পিস।

লুসিডা আছে ?

একটা আছে নীল।

কোন মডেল ?

৯৮ মডেল।

দাম বলুন।

এগারো লাখ।

আপনি তো এখানকার কর্মচারী ?

জি স্যার।

মালিকপক্ষের কেউ কি আছে ?

জি স্যার, আছে, আমি নিয়ে আসি। আপনি কি চা কফি কিছু খাবেন ?

চা কফি কিছুই খাব না। মালিকপক্ষের কেউ থাকলে তাকে ডাকুন।

'কার হেভেনের' মালিক আব্দুর রহমানের সঙ্গে খুবই সহজ ভঙ্গিতে জয়নাল কথা বলল। নিজের কথায় জয়নাল নিজেই মুগ্ধ। এক সময় তার মনে হতে লাগল আসলেই সে গাড়ি কিনতে এসেছে।

আব্দুর রহমান সাহেব, আপনাকে আসল কথা বলি— আগামী মাসের ১১ তারিখ আমার স্ত্রীর জন্মদিন। অনেক আগে তাকে প্রমিজ করেছিলাম তার জন্মদিনে একটা ব্র্যান্ড নিউ লাক্সারি মাইক্রোবাস দেব। ব্র্যান্ড নিউ লাক্সারি মাইক্রোবাস আমি কিনতে চাচ্ছি না। রি-কন্ডিশন গাড়িই কিনব। কিন্তু গাড়ির লুক ভালো হতে হবে। গাড়িতে সান রুফ মুন রুফ আমার কাছে খুবই হাস্যকর লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর আবার এইসব পছন্দ। এখন আপনাকে আমি খোলাখুলি কয়েকটা ব্যাপার বলি— আমার স্ত্রী গেজেটের ভক্ত। গাড়িতে যত বেশি গেজেটস থাকবে তত সে খুশি। তার প্রিয় রঙ নীল। আমার বাজেটটাও বলি। বাজেট দশ লাখ। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ফি-ও তার মধ্যে ইনক্লুডেড।

কিছু কি বাড়ানো যায় ? আরো দুই ?

না।

স্যার, আসুন, কফি খেতে খেতে কথা বলি।

কথা বলতে পারি, তবে কফি খাব না।

চা ?

চা এক কাপ খাওয়া যেতে পারে।

আপনার মিসেসকে নিয়ে এলে ভালো হতো। উনি নিজে পছন্দ করতে পারতেন। মেয়েদের শাড়ি-গাড়ির ব্যাপারে নানা খুঁত-খুঁতানি থাকে।

গাড়িটা তাকে দিতে চাচ্ছি সারপ্রাইজ হিসেবে, আগে দেখে ফেললে তো সারপ্রাইজ এলিমেন্ট নষ্ট হয়ে যায়।

তা ঠিক।

আব্দুর রহমান সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। জয়নাল সিগারেট নিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে টান দিচ্ছে। তার খুবই মজা লাগছে। মনে হচ্ছে সে সত্যি সত্যিই গাড়ি কিনতে এসেছে।

আচ্ছা এরকম দিন কি তার আসবে না ? কেন আসবে না ? আসতেও তো পারে। পথের ফকির থেকে মানুষ কোটিপতি হয়। আবার কোটিপতি থেকে কেউ কেউ হয় শূন্যপতি। সবই ভাগ্যের খেলা। তার বন্ধু বরকত কোরান শরীফের একটা আয়াত সব সময় বলত— সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ্‌পাক বলছেন—

> 'আমি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তার গলায় হারের
> মতো পরিয়ে দিয়েছি।'

আমরা সবাই গলায় অদৃশ্য হার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কার হার কেমন কেউ জানে না।

সাড়ে ছ'টার সময় জয়নাল শামসুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে ইতিদের বাসায় উপস্থিত হলো। ড্রয়িং রুমে ঢোকার মুখেই দুর্ঘটনা। দরজায় ধাক্কা লেগে জয়নালের হাতে ধরা মিষ্টির হাঁড়ি ভেঙে রসগোল্লা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রসগোল্লার রসে জয়নালের প্যান্ট মাখামাখি হয়ে গেল। মিষ্টির হাঁড়ি ভেঙে যাওয়া বড় কিছু না, দুই কেজি রসগোল্লার দাম একশ' আশি টাকা, কিন্তু লক্ষণ অশুভ। শুভদিনে দুর্ঘটনা ঘটা মানেই অশুভ কিছু আছে। জয়নালের বুক টিপটিপ করছে। বোঝাই যাচ্ছে গণ্ডগোল একটা লাগবেই।

ইতিদের বসার ঘরে এক গাদা মানুষ। হাঁড়ি ভাঙা রসগোল্লার কয়েকটা বসার ঘরেও ঢুকেছে। তারা সবাই তাকিয়ে আছে সেই দিকে। সবার মুখই গম্ভীর। ইতির খালু সাহেব শুকনা গলায় বললেন, সাবধানে আসুন। মিষ্টিতে পা পড়লে আছাড় খাবেন। অতিরিক্ত সাবধান হতে গিয়েই জয়নাল মিষ্টির রসে পা দিল। উল্টে

পড়তে পড়তে শামসুদ্দিন সাহেবকে ধরে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। এই প্রক্রিয়ায় লাভের মধ্যে লাভ হলো জয়নালের হাতে ধরা অন্য হাঁড়িগুলিও মেঝেতে ছিটকে পড়ল। দুর্ঘটনা একটার পর একটা ঘটতে শুরু করেছে— এরপরে কপালে কী আছে ? জয়নালের কেমন যেন বমি বমি আসছে। পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে। ঘর-বাড়ি দুলছে। সবার সামনে সে বমি করে দেবে না তো ? হয়তো দেখা যাবে বিয়ের আলাপের এক পর্যায়ে সে হড়হড় করে ইতির খালুর গায়ে বমি করে দিল। বিয়ের আলাপ-আলোচনা এখানেই সমাপ্তি।

জয়নালের শুধু যে বমি পাচ্ছে তা না, বাথরুমও পেয়ে গেছে। তার যে এত প্রবল বাথরুম পেয়েছিল তা আগে বোঝা যায় নি। আগে বুঝতে পারলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হালকা হয়ে আসত। এখন বোঝা যাচ্ছে। তলপেট টনটন করছে। এই মুহূর্তেই বাথরুমে যাওয়া দরকার। বাথরুমে যেতে পারলে বমির কাজটাও সেরে ফেলা যেত। সবচে' ভালো হতো একটা গোসল দিতে পারলে। মাথা গরম হয়ে আছে। মাথায় পানি ঢালতে হবে। বিশ-পঁচিশ মিনিট পানি ঢাললে মাথাটা ঠাণ্ডা হতো।

ইতির বাবা জয়নালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ ?

জয়নাল বলল, জি স্যার শরীর খারাপ। আমার বাথরুমে যাওয়া দরকার। বাথরুমটা কোন দিকে ?

জয়নালকে বাথরুম দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সে হেলতে দুলতে বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। নতুন চশমা পরলে মেঝে যেমন উঁচু নিচু লাগে তার কাছেও এখন সে-রকম লাগছে। মাথা ঘুরাটা অনেকখানি বেড়ে গেছে। দেয়াল ধরে ধরে এগুতে পারলে ভালো হতো। সেটা ঠিক হবে না। ইতিদের বসার ঘরের সবাই ভাববে জামাই দেয়াল ধরে ধরে যাচ্ছে কেন ? সে কি কোনোখান থেকে 'মাল' টেনে এসেছে ? ইতির বাবাকে 'স্যার' ডাকাও ঠিক হয় নি। সবই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আরো এলোমেলো হবে। এতটা সময় পার হয়েছে এখনো একবার আল্লাহ-খোদার নাম নেয়া হয় নি। আল্লাহর নিরানব্বইটা নামের মধ্যে একটা নাম আছে যা বারবার জপ করলে সমুদয় বিপদ কেটে যায়। কত অসংখ্যবার এই নাম জয়নাল জপ করেছে, আজ কিছুতেই নামটা মনে পড়ছে না। আল্লাহরই ইচ্ছা নেই সে বিপদ থেকে পার হয়। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে তার নাম মনে পড়ত। নামটা 'ম' দিয়ে এইটুকু শুধু মনে পড়ছে।

বিয়ের আলাপ-আলোচনার শুরুতেই গণ্ডগোল লেগে গেল। মেয়ের বাবা শামসুদ্দিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ছেলের আপন চাচা ?

শামসুদ্দিন বললেন, জি না।

মেয়ের বাবা বললেন, জয়নাল তো বলেছিল আপনি তার আপন চাচা। তার মানে কী? জয়নাল মিথ্যা কথা বলেছে? এমন মিথ্যাবাদী ছেলের সঙ্গে তো আমি মেয়ে বিয়ে দেব না। অসম্ভব।

এরকম কঠিন কথার পর বিয়ের আলোচনা অগ্রসর হবার কোনো কারণ থাকে না। আলোচনা থেমে গেল। সবাই চুপচাপ বসে রইল। নীরবতা ভঙ্গ করে শামসুদ্দিন বললেন, অনেক দূরের মানুষও মাঝে মাঝে খুব আপন হয়। সেই অর্থে সে আপন বলেছে। মিথ্যা বলে নাই।

মেয়ের বাবা বললেন, মিথ্যা বলে নাই?

শামসুদ্দিন বললেন, জি না। তার বিষয়ে সে কোনো কিছুই আপনাদের কাছে গোপন করে নাই। সে বলে নাই যে তার দেশের বাড়িতে বিরাট বিষয়-সম্পত্তি আছে। বড় বড় আত্মীয়স্বজন আছে। সে যা তাই বলেছে। বিয়ের আলাপ-আলোচনায় সে নিশ্চয়ই কারো না কারো কাছ থেকে একটা গাড়ি জোগাড় করে সেই গাড়িতে করে আসতে পারত। তা না করে সে আমাকে নিয়ে বেবিটেক্সিতে করে এসেছে। তার স্বভাবের মধ্যে যদি মিথ্যা থাকত, ভান থাকত তাহলে অনেক কায়দা দেখাবার চেষ্টা সে করত। সে আমাকে আপন চাচা বলেছে কারণ সে মন থেকে এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করে বলেই বলেছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন সে কিন্তু তার কোনো আত্মীয়স্বজনকে আনে নি। আমাকে নিয়ে এসেছে।

জয়নাল মুগ্ধ চোখে শামসুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে কয়েকবার বলে ফেলেছে— মারাত্মক ব্যাটিং করেছেন চাচাজি। এক ওভারে পাঁচটা ছক্কা মেরেছেন। আর দরকার নেই।

রাত আটটার ভেতর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। বিয়ের তারিখ হয়ে গেল সামনের পঁচিশ তারিখ। দেনমোহর ঠিক হলো পাঁচ লক্ষ এক টাকা, এর মধ্যে গয়নাতে একলক্ষ টাকা উসুল। শামসুদ্দিন ইতির হাতে আংটি পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, মাগো, অতি ভালো একটা ছেলে পেয়েছ। তোমার শাড়ির আঁচল দিয়ে ছেলেটাকে এমনভাবে ঢেকে ঢুকে রাখবে যেন বাইরের কোনো ধুলা ময়লা তার গায়ে না লাগে। দামি রত্ন, যত্ন করে রাখতে হয় গো মা।

শামসুদ্দিন সাহেবের কথা শুনে জয়নালের চোখে পানি এসে গেল। চোখের পানি আটকে রাখার সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। জয়নাল ঠিক করে ফেলল— তার নিজের সংসার যেদিন হবে সেদিন থেকেই এই বুড়োকে সে নিজের সংসারে এনে রাখবে। শুধু দু'জনের সংসার ভালো হয় না। সংসারে মুরুব্বিদের কেউ থাকতে হয়।

বিয়ের আলাপ-আলোচনার শেষে সবাই চা খাচ্ছে। জয়নালের মাথা ঘোরাটা কমে গেছে। তার কেমন শান্তি শান্তি লাগছে। প্রচণ্ড ঘুমও পাচ্ছে। সে ঠিক করে ফেলেছে আজ রাতে আর খাওয়া-দাওয়া করবে না। বাসায় ফিরেই লম্বা ঘুম দেবে।

চা খাওয়া শেষ হবার পর ইতির খালু হঠাৎ বললেন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। সব যখন ঠিক ঠাক হয়েই গেল বিয়েটা পিছিয়ে রেখে লাভ কী! একজন কাজি ডেকে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হোক। শুভ কাজ ফেলে রাখতে হয় না।

সবাই চুপ করে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। জয়নালের মাথা ঘোরা রোগ আবার শুরু হয়েছে। ইতি যে-রকম বলেছিল সে-রকমটা দেখি হচ্ছে। ইতি দেখি ডেনজারাস মেয়ে।

রাত দশটা বাজার আগেই জয়নালের বিয়ে হয়ে গেল।

জয়নাল তার গুহায় ফিরে এসেছে। তার কেমন যেন ঘোর ঘোর লাগছে। এখনো চারপাশের সব কিছু দুলছে। তবে এই দুলুনি আরামদায়ক দুলুনি। সে যেন বিরাট কোনো এক বজরার ছাদে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ধাক্কায় বজরা দুলছে। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ইতিদের বাসায় রাতে খাবারের আয়োজন ছিল। তারা হোটেল থেকে খাবার আনিয়েছিল। জয়নালের শরীর খারাপ লাগছিল বলে কিছু খেতে পারে নি। এখন ক্ষিধে লেগেছে। ঘরে চাল-ডাল আছে। খিচুড়ির মতো রান্না করা যায়। সে ইচ্ছাটাও করছে না। জয়নাল বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তারপরেও সে কষ্ট করে জেগে আছে। আজকের অদ্ভুত দিনটা নিয়ে চিন্তা করতে তার ভালো লাগছে। ঘুমিয়ে পড়লে তো আর চিন্তা করা যাবে না।

দুপুরের ডাকে আসা চিঠিগুলি পড়া হয় নি। এখন পড়া যেতে পারে। আজ চিঠির কোনো দুঃসংবাদই তার কাছে দুঃসংবাদ বলে মনে হবে না। জয়নালের ধারণা ভয়ঙ্কর কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে আসা চিঠি পড়লেও তার ভালো লাগবে।

প্রথম যে চিঠি জয়নাল পড়ল সেটা লিখেছে বরকত। বরকতের চিঠি এসেছে এটা জানলে সে আগেই পড়ত। পৃথিবীর সবচে' খারাপ হাতের লেখা বরকতের। বরকতের হাতের লেখা পড়ে অর্থ বের করা অত্যন্ত কঠিন। বরকত লিখেছে—

জয়নাল,

তোর সঙ্গে অনেকদিন কোনো যোগাযোগ নেই। এদিকে জেল-টেল খেটে আমি অস্থির। হাঁপানি রোগে ধরেছে। দুঃখ-ধান্ধায় মাথার চুল পেকে বুড়ো হয়ে গেছি। এখন আমাকে দেখলে তুই চিনতে পারবি না। তোর মন খারাপ হয়ে যাবে।

জয়নাল শোন, আমি খবর পেয়েছি তুই সবার কাছে আমেরিকা যাবার টিকিটের টাকার জন্যে ধরাধরি করছিস। তোর অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। আমি নিজেও এর ভেতর দিয়ে গিয়েছি। সেই সময় তুই আমার জন্যে যে ছোটাছুটি করেছিস তা আমার মনে আছে রে দোস্ত। তোর ভালোবাসার ঋণ আমার পক্ষে কোনো দিন শোধ করা সম্ভব না। আমি সেই চেষ্টাও করব না। যাই হোক, ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের ঢাকা-আমেরিকা-ঢাকা একটা ওপেন টিকিট তোর জন্যে পাঠালাম। দোস্ত রে এত দুশ্চিন্তা করিস না। আমি আছি না?

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বেশিদিন বাঁচব বলে মনে হয় না। জীবনটা দুঃখ-ধান্ধায় কেটে গেল এই আফসোস।

তুই ভালো থাকিস।

ইতি— বরকত

বৃষ্টি পড়ছে। টিনের চালে বৃষ্টির কী সুন্দর শব্দ! জয়নাল বিছানায় শুয়ে আছে। বরকতের মুখ মনে করার চেষ্টা করছে। কিছুতেই মনে পড়ছে না। মানুষের মস্তিষ্কের এই এক আশ্চর্য ব্যাপার— মানব মস্তিষ্ক অতি প্রিয়জনদের চেহারা কখনোই হুবহু মনে করতে পারে না। কল্পনায় আবছা ধোয়াটে ছবি ফুটে উঠে— যে ছবি কখনোই স্পষ্ট হয় না।

বৃষ্টি পড়ছে। আহ্ কী মিষ্টি ঝুনঝুন শব্দ! এই শব্দটা না হলেই ভালো হতো। ঘুমপাড়ানি গানের মতো শব্দটা ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। জয়নাল ঘুমুতে চায় না। সে জেগে থাকতে চায়। আজ সারা রাত সে জেগে থেকে আনন্দ করবে। মনে মনে কথা বলবে ইতির সঙ্গে। আজ তার জীবনের বিশেষ একটি রাত। বিয়ের রাত। বাসর হচ্ছে না, তাতে কী? গুহার ভেতরে সে নিশ্চয়ই ইতিকে নিয়ে বাসর সাজাবে না। ইতিও কি জেগে আছে? হয়তো জেগে আছে। তার বান্ধবীরা চলে এসেছে। সবাই মিলে গুটুর গুটুর করে গল্প করছে।

দরজার কড়া নড়ছে। কে আসবে এত রাতে? জয়নাল দরজা খুলল। দশ-এগারো বছরের একটা অপরিচিত মেয়ে বড় একটা স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। জয়নাল বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি কে?

মেয়েটা বলল, আমার নাম ফুলি।

আমার কাছে কী?

আফা আসছে।

আফা আসছে মানে কী? আফা কে?

গেটের কাছে একটা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে ইতি নামছে। ইতির মাথায় ছাতা ধরে আছেন ইতির খালু। ইতি মাথা উঁচু করে জয়নালকে দেখে তার খালুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে আসতে হবে না। আপনি থাকুন। আমি ফুলিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পুরো ব্যাপারটা কি স্বপ্নে ঘটছে ? ইতির তো এখানে আসার কথা না। না-কি কোনো ঝামেলা হয়েছে ? বিয়ে যেটা হয়েছিল সেটা বাতিল। কিন্তু বাতিল হলে তো স্যুটকেস নিয়ে কাজের মেয়ের আসার কথা না। কী ঘটছে চারদিকে!

ইতি খুব স্বাভাবিকভাবে ঘরে ঢুকে বলল, তোমাকে বলেছিলাম না, আমি এখানে থাকব। থাকতে এসেছি।

জয়নাল বলল, ও।

ইতি বলল, তোমার এখানে রাতে থাকতে আসব শুনে বাসায় খুব হৈচৈ হচ্ছে। বাবা ভয়ঙ্কর রাগ করেছেন। মা রাগ করেছেন। সবাই আমাকে বেহায়া ডাকছে। শুধু একজন আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে। সেই একজন কে বলো তো ? আমার দাদি। এরকম অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছ কেন ?

জয়নাল বলল, তুমি যে সত্যি সত্যি এসেছ এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

ইতি বলল, বিশ্বাস না হলে কী আর করা! বিছানা থেকে চাদরটা সরাও। বালিশের ওয়ার খোল। আমি নতুন চাদর আর বালিশের ওয়ার নিয়ে এসেছি। আচ্ছা শোন, আজ তুমি যখন মিষ্টির হাঁড়ি ভেঙে চারদিকে রসগোল্লা ছড়িয়ে দিলে তখন কে সবচে' বেশি খুশি হয়েছিল জানো ? আমার দাদিজান।

এতে খুশি হবার কী আছে ?

বিয়ের আলাপের সময় মিষ্টির হাঁড়ি ভেঙে যাওয়া নাকি খুবই শুভ লক্ষণ। দৈ-এর হাঁড়ি ভাঙাও শুভ। তুমি তো মিষ্টির সঙ্গে দৈও এনেছিলে। দৈ-এর হাঁড়িটা ভাঙতে পারলে না ?

ইতি খিলখিল করে হাসছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে হাসির শব্দ এমন সুন্দর করে মিশে গেছে! জয়নালের মনে হলো— আকাশ, বাতাস এবং পাতালে এক সঙ্গে জলতরঙ্গ বাজছে।

শামসুদ্দিন সাহেব আছরের নামাজ পড়তে পারলেন না।

নামাজে দাঁড়ানোর পর থেকে তাঁর হাঁচি শুরু হয়ে গেল। তিনি নামাজ রেখে জায়নামাজে বসে পড়লেন। হাঁচি বন্ধ হলো না। এক সময় নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। হাঁচির সময় মাঝে মাঝে রক্ত যায় কিন্তু এরকম অবস্থা কখনো হয় না। শামসুদ্দিন সাহেবের পাঞ্জাবি রক্তে লাল হয়ে গেল।

খাটের উপর পৃথু পা ঝুলিয়ে বসে আছে। সে অবাক হয়ে বড় মামার নাক দিয়ে রক্ত পড়া দেখছে। একই সঙ্গে সে হাঁচির হিসাবও রাখছে। বিড়বিড় করে বলছে, থার্টি টু, থার্টি থ্রি, থার্টি ফোর। কিছুক্ষণের মধ্যে কার্টুন চ্যানেলে একটা মজার কার্টুন হবে। পৃথু এসেছিল বড় মামার সঙ্গে কার্টুন দেখবে এই পরিকল্পনা নিয়ে। এখন মনে হচ্ছে তাকে একা একাই কার্টুন দেখতে হবে। কোনো ভালো জিনিস একা দেখে আরাম নেই। কিন্তু উপায় কী! যে লোকটার নাক দিয়ে ক্রমাগত রক্ত পড়ছে তাকে সে নিশ্চয়ই কার্টুন দেখতে বলতে পারে না।

পৃথু!

জি বড় মামা।

পানি খাওয়াতে পারবি?

পৃথু খাট থেকে নামল। পানি খাওয়াতে সে অবশ্যই পারবে। ফ্রিজ খুলে পানির বোতল বের করে সেই বোতলের পানি গ্লাসে ঢেলে নিয়ে আসা। খুব সহজ কাজ। পৃথুর যেতে ইচ্ছা করছে না, কারণ সামনে থেকে গেলেই হাঁচি গুনতে গণ্ডগোল হয়ে যাবে। এখন যাচ্ছে ফিফটি থ্রি। পৃথু রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো।

ফ্রিজ ধরা পৃথুর জন্যে নিষেধ। মা বলেছে পৃথুকে যদি কখনো দেখা যায় সে ফ্রিজ খুলছে তাহলে তাকে কানে ধরে তিনবার উঠবোস করাবে। আজ সেই ভয় নেই— মা কোথায় যেন চলে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে আর কোনোদিন সে এ বাড়িতে ফিরবে না। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের কিন্তু পৃথুর খুব বেশি দুঃখ লাগছে না। বরং একটু যেন ভালো লাগছে।

পৃথু পানি এনে দেখল বড় মামা জায়নামাজের উপর শুয়ে আছেন। আঙুল দিয়ে নাক চেপে ধরে মুখে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। পৃথু বলল, পানি এনেছি মামা।

শামসুদ্দিন হাতের ইশারায় জানালেন পানি খাবেন না। পৃথু টিভির সামনে চলে গেল। বড় মামার হাঁচি বন্ধ হয়েছে, এখন আর হাঁচি শুনতে হবে না। টিভি দেখতে দেখতে হাঁচি শুনতে হলে খুব সমস্যা হতো। সব মিলিয়ে আজ বড় মামা সেভেন্টি ওয়ান হাঁচি দিয়েছেন। হানড্রেডের অনেক নিচে। এটা খুব দুঃখের ব্যাপার— বড় মামা কখনো হানড্রেড করতে পারেন না।

শামসুদ্দিন অবাক হয়ে রক্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। আশ্চর্য, এত রক্ত শরীর থেকে গেছে ! হাঁচি বন্ধ হয়েছে। রক্ত পড়াও মনে হয় বন্ধ হয়েছে। জায়নামাজ থেকে উঠে রক্ত ধুয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত। তিনি অনেক চেষ্টা করেও উঠে বসতে পারলেন না। একা একা উঠা যাবে না। একজন কাউকে লাগবে যে তাকে ধরে ধরে বিছানায় নিয়ে যাবে। বাসায় পৃথু ছাড়া কেউ নেই। রাহেলা সকালবেলায় রাগারাগি করে বাসা থেকে বের হয়েছে। রফিক গেছে তাকে খুঁজে আনতে। তারা কখন ফিরবে কে জানে! যতক্ষণ না ফিরবে ততক্ষণ কি রক্তের বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে ?

শামসুদ্দিন চোখ বন্ধ করলেন। মাথা দুলছে। চোখ বন্ধ করলে দুলুনিটা কম লাগে। কিছুক্ষণ ঘুমুতে পারলে হতো। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত হলে ঘুম আসে না। কেউ একজন মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে ভালো লাগত। পৃথুকে কি ডাকবেন ? না থাক, বেচারা আরাম করে টিভি দেখছে।

বীথির সঙ্গে বিয়ে হলে সে এই অবস্থা দেখলে কী করত কে জানে ? নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে পড়ত। একজন মানুষের জন্যে অন্য একজন মানুষের অস্থিরতা দেখতে এত ভালো লাগে! এই অস্থিরতার নামই কি ভালোবাসা ? 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই বাক্যটির মানে কি— আমি তোমার জন্যে অস্থির হয়ে থাকি ? কে জানে ভালোবাসা মানে কী ? তিনি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েন নি। প্রেমে না পড়েও তিনি বীথি নামের একটি মেয়ের জন্য প্রবল অস্থিরতা বোধ করেছিলেন। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর একদিন শুধু মেয়েটির সঙ্গে কথা হয়েছে। বীথির ছোট চাচি বীথিকে তার বাসায় ডেকেছিলেন, শামসুদ্দিনকেও ডেকেছিলেন। তিনি শামসুদ্দিনকে বললেন, তোমরা নিজেরা কিছুক্ষণ গল্পগুজব কর। বিয়ের আগে কিছুটা পরিচয় থাকা ভালো। যাও, ছাদে চলে যাও। আমি চা পাঠাচ্ছি।

শামসুদ্দিনের পিছনে পিছনে লজ্জিত ভঙ্গিতে বীথি ছাদে উঠছে। হঠাৎ সিঁড়িতে শামসুদ্দিনের পা পিছলে গেল। তিনি হুড়মুড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, তখন বীথি চট করে তাঁকে ধরে ফেলল। শামসুদ্দিন খুবই লজ্জা পাচ্ছিলেন। বীথি তখন

তার দিকে তাকিয়ে কোমল ভঙ্গিতে হাসল। হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল— আপনি কেন শুধু শুধু লজ্জা পাচ্ছেন ? লজ্জা পাবার মতো কিছু হয় নি।

ছাদে তাদের কোনো কথা হয় নি। রেলিং ধরে দু'জন অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর শামসুদ্দিন বললেন, আমার খুব অদ্ভুত একটা ডাক নাম আছে। চৈতার বাপ। অদ্ভুত না ?

বীথি হাসিমুখে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শামসুদ্দিন ভেবেছিলেন, বীথি কোনো কথাই বলবে না। অথচ বীথি তাকে চমকে দিয়ে বলল, আমার কোনো ডাক নাম নাই। আমার ভালো নাম ডাক নাম দু'টাই বীথি।

শামসুদ্দিন তখন ছোট্ট একটা রসিকতা করলেন। বীথির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ডাক নাম যদি চৈতার বাপ হয় তাহলে তোমার ডাক নাম চৈতার মা।

বীথি শব্দ করে হেসে ফেলল। শামসুদ্দিনের সেই হাসি শুনে কেমন যেন লাগল। মনে হলো সমস্ত শরীর দুলে দুলে উঠছে। চোখের সামনেও সব কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি হঠাৎ গাঢ় স্বরে বললেন, বীথি শোন, আমি খুব দুঃখ-কষ্টে বড় হয়েছি। মানুষের দুঃখ-কষ্ট আমি জানি। আমি সারা জীবন তোমাকে কখনো কোনো কষ্ট দেব না।

বীথি মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, মনে থাকে যেন।

এই পর্যন্তই তাদের কথাবার্তা।

বীথির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় নি। বিয়ের আসরে তাঁকে জানানো হয়েছে মেয়ে হঠাৎ কেন জানি বলছে বিয়ে করবে না।

আমেরিকায় পঁয়ত্রিশ বছর পর বীথির সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। তিনি বীথিকে বলবেন— আমি বলেছিলাম সারা জীবনে তোমাকে কোনো কষ্ট দেব না। বীথি, আমি আমার কথা রেখেছি। তোমাকে কোনো কষ্ট দেই নি।

শামসুদ্দিনের খুব দেখার ইচ্ছা তাঁর কথা শোনার পর বীথি ঐ দিনের মতো মুখ টিপে হাসে কি না। বীথির ছেলেমেয়েগুলিকেও তাঁর খুব দেখার শখ। এই ছেলেমেয়েগুলি তাঁরও হতে পারত।

পৃথু শুনল বড় মামা আবার হাঁচি দিচ্ছেন। সে সঙ্গে সঙ্গে গুনতে শুরু করল সেভেন্টি টু, সেভেন্টি থ্রি, সেভেনটি ফোর। পৃথুর বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে মামা এবার হানড্রেড করে ফেলবে। হানড্রেড মানে সেঞ্চুরি। ক্রিকেট প্লেয়াররা সেঞ্চুরি করে। তাদের তখন খুব আনন্দ হয়। কলিংবেল বাজছে। মনে হচ্ছে বাবা

এসেছে। পৃথু দরজা খুলতে গেল। সে এখন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দরজা খুলতে পারে।

না, বাবা আসে নি। জয়নাল নামের মানুষটা এসেছে। জয়নাল হাসি হাসি মুখে বলল, কেমন আছ খোকা ?

জয়নাল মানুষটা ভালো। সে যতবার এ বাড়িতে আসে ততবারই পৃথুর জন্যে কিট-ক্যাট নিয়ে আসে। আজ মনে হয় আনে নি।

পৃথু বলল, আমি ভালো আছি। আমার বড় মামার শরীর খুব খারাপ। আপনি তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে যান।

তাঁর কী হয়েছে ?

পৃথু জবাব না দিয়ে টেলিভিশন দেখতে চলে গেল। সে সামান্য দুশ্চিন্তায় পড়েছে। জয়নাল নামের এই মানুষটা অবশ্যই বড় মামাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তাকে একা বাসায় ফেলে যাবে না। তাকেও নিয়ে যাবে। হাসপাতালে টেলিভিশন নেই। সে কী করবে ? একা একা বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করবে ? পৃথু খুবই দুশ্চিন্তা বোধ করছে। দুশ্চিন্তার কারণে বড় মামার হাঁচি গুনতে ভুলে গেছে। তিনি হয়তো হানড্রেড করে ফেলেছেন অথচ হিসাবটা কেউ রাখতে পারল না। পৃথু টেলিভিশনে মন দিল। খুবই মজার একটা কার্টুন হচ্ছে। সব দুষ্ট লোক পটাপট মরে যাচ্ছে। ভালো লোকগুলি শত বিপদে পড়েও বেঁচে যাচ্ছে। পৃথু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, জীবনটা কার্টুনের মতো হলো না কেন ? কার্টুনের জীবনে কোনো দুঃখ নেই। শুধুই আনন্দ। এই জীবনে ভালো লোকরা কখনো মারা যায় না। বড় মামা খুব ভালো লোক। কার্টুনে বড় মামা কখনো মারা যাবেন না। নাক দিয়ে অনেক রক্ত পড়ার পরও বেঁচে থাকবেন।

শামসুদ্দিন সাহেব চোখ মেলে ধাক্কার মতো খেলেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। সবই কেমন অন্যরকম। সবই অচেনা। তিনি অপরিচিত একটা ঘরের অপরিচিত বিছানায় শুয়ে আছেন। ঝাড়বাতি জ্বলছে, কিন্তু আলো কম। সেই আলোয় সবই আবছা দেখাচ্ছে। কোনো কিছুই স্পষ্ট না। তার বিছানার পাশের চেয়ারে যে বসে আছে সে কে ? বীথি ? বীথি এখানে কোত্থেকে এলো ? তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন ? তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। আবার চোখ খুললেন। অবশ্যই বীথি বসে আছে। তাকে তিনি একবারই দেখেছিলেন। চেহারা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই চেহারা মনে পড়ল। কী সুন্দর কোমল মুখ! শামসুদ্দিন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, কেমন আছ ?

বীথি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে বলল, চাচাজি, আপনার ঘুম ভেঙেছে ?

শামসুদ্দিনের সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। এই মেয়ে বীথি না। বীথির এত অল্প বয়স হবে না। বীথি তাকে চাচাজিও ডাকবে না। তা হলে এই মেয়েটা কে ? বীথি তো বটেই; সেই চোখ, সেই মুখ। গলার স্বরও সে-রকম। শামসুদ্দিন সাহেব হতাশ চোখে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরা তরুণী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। কষ্ট করে চোখ খোলা রাখতে হচ্ছে।

চাচাজি আপনি কি আমকে চিনতে পারছেন ? আমার নাম ইতি। আমাকে চিনেছেন ?

শামসুদ্দিন ঘুম ঘুম চোখে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। ইতি বলল, আপনাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এখন আপনার শরীরটা কেমন লাগছে ?

ভালো।

আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। শরীর থেকে অনেক রক্ত গেছে তো, এই জন্য আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আপনাকে তিন ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়েছে। আরো রক্ত দেয়া হবে।

শামসুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, আচ্ছা।

চাচাজি, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। বলুন তো আমি কে ?

শামসুদ্দিন অস্পষ্ট গলায় বললেন, তুমি বীথি।

জি না চাচাজি, আমার নাম ইতি। আমি জয়নালের স্ত্রী। আমাদের বিয়ের সময় আপনি ছিলেন। আপনি ছেলে পক্ষের উকিল। এখন মনে পড়ছে ?

হ্যাঁ। জয়নাল কোথায় ?

ও আপনাকে নিয়েই ছোটাছুটি করছে। চলে আসবে।

শামসুদ্দিন অস্পষ্ট গলায় বললেন, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। তুমি কিছু মনে করো না। আমি খুবই লজ্জিত।

ইতি বলল, কী আশ্চর্য কথা! আমি কিছু মনে করব কেন ? আপনার উপর দিয়ে যে ঝড় গিয়েছে আপনার তো কিছুই মনে থাকার কথা না। চাচাজি, আমি আপনার গায়ে হাত বুলিয়ে দেই ?

দরকার নাই।

না বলার পরও ইতি হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটার হাতে ভালো মায়া আছে। শামসুদ্দিনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে শরীরে আরামদায়ক আলস্য।

ইতি বলল, চাচাজি আপনি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। তারপর জয়নালকে নিয়ে আমেরিকা চলে যান। সেখানে অবশ্যই আপনি বড় ডাক্তার দেখাবেন।

শামসুদ্দিন বললেন, আমি একটু পানি খাব।

ইতি চামচে করে পানি শামসুদ্দিন সাহেবের মুখে দিচ্ছে। তিনি আগ্রহ করে পানি খাচ্ছেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে ঠিক এই ভাবে অনেককাল আগে কেউ একজন তাকে চামচে করে পানি খাইয়েছে। সেই একজনটা কে তাঁর মনে পড়ছে না। সেই জন্যে খুব অস্বস্তি লাগছে। অস্বস্তিটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনে হচ্ছে নামটা মনে না পড়লে অস্বস্তিটা এক সময় খুবই বেড়ে যাবে। তাঁর হাঁচি আবারো শুরু হয়ে যাবে।

পানি আর খাব না।

ইতি পানির গ্লাসটা টেবিলে রাখতে গেল। তখন শামসুদ্দিন সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন, যে চেয়ারটায় ইতি বসেছিল সেই চেয়ারে বৃদ্ধ একজন মানুষ পা গুটিয়ে বসে আছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ইতির দিকে। সেই বৃদ্ধ মানুষটা আর কেউ না, তাঁর বাবা।

শামসুদ্দিনের মনে হলো তিনি মারা যাচ্ছেন। মৃত্যুর আগে আগে মানুষ তার মৃত আত্মীয় স্বজনকে দেখে। তিনিও তাই দেখছেন। চেয়ারে বসা বৃদ্ধ ঝুঁকে এসে বলল, ও চৈতার বাপ, এই সুন্দরমতো মেয়েটা কে?

শামসুদ্দিন বললেন, এর নাম ইতি। জয়নালের বউ।

কোন জয়নাল? সিরাজদিয়ার জয়নাল?

না বাবা, সিরাজদিয়ার জয়নাল চাচা না। আপনি তাকে চিনবেন না।

তোর শরীরটা তো দেখি ভালো না।

আমার শরীর খুবই খারাপ।

আমার নিজেরও শরীর খারাপ। পায়ে ব্যথা। গরম সেঁক দিতে পারলে হতো। যেখানে থাকি সেখানে গরম সেঁক দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই।

আপনি থাকেন কোথায়?

চিপাচাপায় পড়ে থাকি। মানুষকে ঠিকানা দিতেও ভয় লাগে। আচ্ছা তোকে একদিন নিয়ে যাব। তোর শরীরটা সারুক তারপর নিয়ে যাব। হাঁটাপথে যেতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা কাহিল। রাস্তাও ভালো না। পথে পথে কংকর।

শামসুদ্দিন চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর চারপাশে কী হচ্ছে তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না। তাঁকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। এই ঘুমের মানেই কি মৃত্যু? ঘুম আর ভাঙবে না। সত্যি সত্যি যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে তো ইতিকে কিছু কথা বলা দরকার। যেমন তিনি ঠিক করে রেখেছেন জয়নালের আমেরিকা যাবার টিকিটের টাকাটা তিনি দেবেন। বেচারা অনেক ছোটাছুটি করেও টিকিটের টাকা জোগাড় করতে পারছে না। সে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। বেচারাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা দরকার।

ইতি!

জি চাচাজি?

একটু দেখ তো— চেয়ারে কি কেউ বসে আছে?

ইতি বিস্মিত হয়ে বলল, না তো।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ইতি বলল, আপনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। আমি একজন ডাক্তার ডেকে আনি।

ডাক্তার ডাকতে হবে না। কয়টা বাজে?

দশটা পঁচিশ।

ইতি ডাক্তার ডাকতে গেল। ঠিক তখনই শামসুদ্দিন হাঁচি দিলেন। চেয়ারে বসে থাকা বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ। শামসুদ্দিন আবারো হাঁচি দিলেন। বৃদ্ধ বললেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ। বৃদ্ধের মুখ হাসি হাসি। মনে হচ্ছে বৃদ্ধ খুব মজা পাচ্ছে।

রাত এগারোটা বাজে।

রফিকের মেজাজ ভয়ঙ্কর খারাপ। মেজাজ সামলানোর চেষ্টা করছে। সামলাতে পারছে না। সে পৃথুর সঙ্গে বসে আছে। তার দৃষ্টিও ছেলের মতোই টেলিভিশন সেটের দিকে। টেলিভিশনে কিছু একটা হচ্ছে, কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে পৃথু খিলখিল করে হেসে উঠছে, তখন সে তাকাচ্ছে পৃথুর দিকে। সেই দৃষ্টিতে কোনো মমতা নেই।

পৃথু বলল, বাবা, মা কখন আসবে?

রফিক বলল, জানি না।

রাতে ফিরবে?

সেটাও জানি না।

রাতে আমরা ভাত খাব না বাবা ?

তোমার মা'র জন্যে আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। এর মধ্যে সে যদি না ফিরে তাহলে হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসব।

বড় মামাকে খাবার দিয়ে আসতে হবে না ?

তাও জানি না।

বড় মামা কি মারা যাবে বাবা ?

মারা যাবে কেন ? উদ্ভট ধরনের কথা বলবে না।

উদ্ভট ধরনের কথা কাকে বলে বাবা ?

জানি না কাকে বলে। প্লিজ চুপ করে থাক।

মা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ কি আমি টিভি দেখতে পারব ?

হ্যাঁ, পারবে।

মা যদি রাতে না ফিরে তাহলে কাল আমাকে স্কুলে যেতে হবে না, তাই না বাবা ?

পৃথু, আর কোনো কথা শুনতে চাই না।

আচ্ছা আর কথা বলব না।

পৃথু শোন, আমার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আমি দোকানে সিগারেট কিনতে যাব। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ? না-কি টিভি দেখবে ?

আমি টিভি দেখব।

একা একা ভয় পাবে না তো ?

না।

তুমি থাক, সেটাই ভালো। বাড়িওয়ালার বাসায় তোমার মা টেলিফোন করতে পারেন। তোমাকে খবর দিলেই তুমি টেলিফোন ধরবে।

আচ্ছা।

টেলিফোনে কী বলবে শুনে রাখ। তুমি বলবে যে তোমার বড় মামা খুবই অসুস্থ। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তোমার মা যেন এক্ষুণি চলে আসে।

আচ্ছা।

আমি বেশি দেরি করব না। যাব আর সিগারেট নিয়ে চলে আসব।

আচ্ছা।

রফিক সিগারেট কিনতে বের হলো। টেনশনের সময় ঘনঘন সিগারেট

টানতে ইচ্ছা করে। দু'ঘণ্টার উপর হয়ে গেছে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে না। যে-কোনো মুহূর্তে রাহেলা টেলিফোন করতে পারে— এই ভেবে সে যায় নি। টেলিফোন এখনো আসে নি। রাগ করে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়া রাহেলার জন্যে কোনো নতুন ব্যাপার না। তবে যতবারই সে বাইরে গিয়েছে রাত দশটার আগে ফিরে এসেছে। তার যাবার জায়গাও সীমিত। যে সব জায়গায় তার যাবার সম্ভাবনা তার প্রতিটি রফিক খুঁজে এসেছে। রাহেলা নেই।

রফিক কী করবে বুঝতে পারছে না। শামসুদ্দিন সাহেব হাসপাতালে পড়ে আছেন। রফিকের উচিত তাঁর পাশে থাকা। চিকিৎসার কী হচ্ছে না হচ্ছে তার খোঁজ নেয়া। অথচ সে পৃথুর সঙ্গে টিভি সেটের সামনে। জয়নাল নামের নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করছে। জয়নাল সম্পর্কে আগে যা ভাবা হয়েছিল তা ঠিক না। মানুষটা অবশ্যই ভালো।

রাহেলা টেলিফোন করল রাত বারটায়। বাড়িওয়ালার ছেলে খুবই বিরক্তমুখে খবর দিতে এলো। এত বিরক্ত হবার মতো কিছু ঘটে নি। ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন তৈরি হতেই পারে। ভয়ঙ্কর কোনো বিপদে রাত বারটার সময় ভাড়াটের টেলিফোন আসতেই পারে।

রফিক মাথা ঠাণ্ডা রেখে টেলিফোন ধরল। সে ঠিক করে রাখল রাহেলার সঙ্গে খুব শান্ত গলায় কথা বলবে। কোনোরকম রাগারাগি করবে না। ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে বাসায় নিয়ে আসতে হবে।

টেলিফোন ধরতেই রাহেলা বলল, হ্যালো শোন, আমি নেত্রকোনা যাচ্ছি। কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে টেলিফোন করছি।

নেত্রকোনা যাচ্ছি মানে কী ? নেত্রকোনার কোথায় যাচ্ছ ?

বাবার বাড়িতে যাচ্ছি। না-কি বাবার বাড়িতেও যেতে পারব না ? বাবার বাড়িতে যেতে হলেও তোমার কাছ থেকে ভিসা নিতে হবে ?

রাহেলা আমার কথা একটা কথা শোন...

রফিকের কথার মাঝখানে রাহেলা চেঁচিয়ে বলল, তোমার কোনো কথা শুনব না। এখন থেকে আমি কথা বলব, তুমি শুনবে। তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কের এখানেই ইতি। তুমি যদি আমাকে আনতে যাও তাহলে গুণ্ডা দিয়ে তোমাকে জুতা পেটা করাব। চরিত্রহীন বদ কোথাকার!

রাহেলা শোন, বাসায়...

আবার কথা বলে! খবরদার কথা বলবি না। খবরদার।

রাহেলা খট করে টেলিফোন লাইন কেটে দিল।

রাহেলার খুব মজা লাগছে। পৃথুর বাবা এখন চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হোক। ছোটাছুটি করতে থাকুক। রাহেলা নিশ্চিত পৃথুর বাবা কমলাপুর রেলস্টেশনে চলে যাবে। স্টেশনের এ-মাথা ও-মাথা তাকে খুঁজবে। তার মাথায় সপ্ত আকাশ ভেঙে পড়বে। পড়ুক আকাশ ভেঙে। শিক্ষা হোক। রাহেলার সবাইকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করছে। কঠিন শিক্ষা। যে-ই তার কাছে আসবে সে-ই শিক্ষা পাবে। সে-ই বুঝবে কত ধানে কত চাল।

সমস্যা হচ্ছে পৃথুর বাবা মানুষটা ভালো। শুধু ভালো না, বেশ ভালো। তারপরেও রাহেলা তাকে শিক্ষা দেবে। সে সুখে নেই, অন্যরা কেন সুখে থাকবে? তার গায়ে আগুন জ্বলছে, অন্যদের গায়ে কেন জ্বলবে না? অন্যদের গায়ে কেন ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোটা পড়বে?

রাহেলা খুব ঘামছে। সে বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার মন এখন খুবই ভালো, কিন্তু শরীর ভালো লাগছে না। রাহেলা এসে উঠেছে তার কলেজ জীবনের বান্ধবী শায়লার বাসায়। রাহেলা কলেজ পাশ করতে পারে নি, তার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। শায়লা ঠিকই কলেজ পাশ করেছে— মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হয়েছে। কোনো এক ক্লিনিকে ডাক্তারি করে। মাসে কুড়ি হাজার টাকা পায়। অথচ এই মেয়ে কলেজে হাবাগোবা ছিল। তাকে সবাই ডাকত 'হাবলি বেগম'। হাবা থেকে হাবলি। সেই হাবলি মাসে কুড়ি হাজার টাকা পায়। স্বামী চাকরি করে। একটা মাত্র বাচ্চা। বাড়ি ভর্তি জিনিসপত্র। এর মধ্যে একটা হলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন। বোতাম টিপলেই ঠাণ্ডা খাবার গরম হয়ে যায়। হাবলিটা কত সুখে আছে, আর তার কী অবস্থা!

রাহেলা সোফায় বসে হাঁপাচ্ছে। শায়লা বলল, তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?

রাহেলা না-সূচক মাথা নাড়ল।

শায়লা বলল, কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

পৃথুর বাবার সঙ্গে।

কঠিন রাগারাগি চলছে?

রাহেলা বলল, হ্যাঁ।

শায়লা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাগরাগি হওয়া ভালো। যত বেশি রাগারাগি হবে তাদের ভেতরের বন্ধন তত শক্ত হবে।

এটা কি তোর ডাক্তারি কথা?

ডাক্তারি কথা না, এটা আমার মনের কথা। আমি যখনই কোনো স্বামী-স্ত্রীকে ঝগড়া করতে দেখি আমার হিংসা হয়। ভালোবাসা আছে বলেই ঝগড়া হচ্ছে। আমার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের কখনোই কোনো রাগারাগি হয় না। সে সারাদিন তার মতো অফিস করে। আমি ক্লিনিকে থাকি। রাতে এক সঙ্গে ডিনার খাই। টুকটাক গল্প করি। কিছুক্ষণ টিভি দেখে দু'জনে দু'টা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে যাই। আবার সকালবেলা দু'জন দু'দিকে চলে যাই। তোদের ঝগড়া কী নিয়ে হয়?

সবকিছু নিয়েই হয়।

শায়লা মুগ্ধ গলায় বলল, কী রোমান্টিক! তুই রাগ করে বাসা থেকে চলে এসেছিস— মিথ্যা করে বললি তুই আছিস কমলাপুর রেলস্টেশনে। সেই বেচারা তোকে স্টেশনে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভাবতেই ভালো লাগছে। তুই চা-কফি কিছু খাবি?

রাহেলা বলল, না। আমি বাসায় যাব।

শায়লা অবাক হয়ে বলল, এখন বাসায় যাবি মানে কী? রাত একটা বাজে।

বাজুক রাত একটা। আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। আমার শরীর খারাপ লাগছে। বুক ধড়ফড় করছে।

এত রাতে বাসায় যাবি কীভাবে?

তুই তো গাড়ি চালাতে পারিস। তুই আমাকে গাড়ি করে নামিয়ে দিবি। আর তা যদি না পারিস— দারোয়ান পাঠিয়ে রিকশা বা বেবিটেক্সি কিছু একটা এনে দে। আমি একা চলে যাব।

একা চলে যাবি?

হুঁ।

শায়লা বলল, তোর তো মাথা খারাপ। কোনো ভালো সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে তোর চিকিৎসা করানো উচিত।

রাহেলা বলল, চিকিৎসা করাব। এই মুহূর্তে তো আর চিকিৎসা করানো যাচ্ছে না। এখন আমি বাসায় যাব।

রাহেলা সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে একাই দরজা খুলে বের হয়ে যাবে। শায়লা বিরক্ত গলায় বলল, দাঁড়া গাড়ি বের করছি। তোকে আমার দোহাই লাগে, আবার যদি তোদের মধ্যে রাগারাগি হয় আমাদের বাসায় আসবি না।

রাত দু'টা বাজে।

হাসপাতালের বারান্দার রেলিং-এ হেলান দিয়ে জয়নাল দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে সিগারেট। হাসপাতালে সিগারেট খাওয়া নিষেধ। রাত বারটার পর সব নিষেধই খানিকটা দুর্বল হয়ে যায়— এই ভরসায় জয়নাল সিগারেট ধরিয়েছে। সাধারণত খালি পেটে সিগারেটে টান দিলে গা গুলায়। আজ গা গুলাচ্ছে না। বরং ভালো লাগছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। একটা পাটি থাকলে মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ত।

জয়নালের মন অস্বাভাবিক ভালো। শামসুদ্দিন সাহেব এখন চোখ মেলে তাকাচ্ছেন। কথাবার্তা বলছেন। তাঁর প্রেসার নেমে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ডাক্তার বলছেন, ভয়ের কিছু নেই। রোগীর যা দরকার তা হলো— রেস্ট। হাসপাতালেও রোগী রাখার দরকার নেই। সকালবেলা বাড়িতে নিয়ে গেলেই হবে। জয়নাল ঠিক করেছে রাতটা হাসপাতালের বারান্দায় পার করে দিয়ে ভোরবেলা রোগী রিলিজ করে বাসায় ফিরবে। সার্বক্ষণিকভাবে সে নিজেই রোগী দেখবে। ইতি তো আছেই। যতই দিন যাচ্ছে ইতি মেয়েটাকে তার ততই পছন্দ হচ্ছে। এক সময় তার ধারণা ছিল ইতি চ্যাং ব্যাঙ টাইপ মেয়ে। এখন সে ধারণা পাল্টে গেছে। চ্যাং ব্যাঙ টাইপ মেয়ে অপরিচিত একজন অসুস্থ মানুষ নিয়ে এত ঝামেলা করে না। ইতি করেছে। এখন সে গিয়েছে চায়ের খোঁজে। রাত দু'টার সময় চা পাওয়ার কথা না। তবে ইতি যেমন স্মার্ট মেয়ে— ব্যবস্থা করবেই।

করিডোরের মাথায় ইতিকে দেখা গেল। তার হাতে লাল রঙের ছোট্ট ফ্লাস্ক। আরেক হাতে কাগজের ঠোঙ্গা। নিশ্চয়ই খাবারদাবার আছে। জয়নালের মন সামান্য খারাপ হয়ে গেল। নাশতা খেয়ে চা খাবার পর একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করবে। জয়নালের সঙ্গে সিগারেট নেই। শেষ সিগারেটটা সে একটু আগে শেষ করেছে।

ইতি প্যাকেট ভর্তি গরম সিঙাড়া এনেছে, কলা এনেছে। এক রোগীর কাছ থেকে ফ্লাস্ক ধার করে— ফ্লাস্ক ভর্তি চা এনেছে। ছোট্ট কাগজের প্যাকেটে দু'টা মিষ্টি পান। তারচেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হলো— ইতি এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট এবং একটা দেয়াশলাইও এনেছে। জয়নাল সিঙাড়ায় কামড় দিতে দিতে স্বাভাবিক গলায় বলল, সিগারেট কী মনে করে এনেছ? ইতি বলল, টেনশনে পড়ে তুমি যে হারে সিগারেট টানছ আমার ধারণা তোমার সিগারেট শেষ। চায়ের সঙ্গে তুমি আরাম করে সিগারেট খাও। যদি সিগারেট না থাকে এই ভেবে কিনেছি।

জয়নাল ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলল, আগামী দশ বছরে তুমি যে সব অপরাধ করবে তার প্রতিটি আমি অ্যাডভান্স ক্ষমা করে দিলাম।

ইতি হাসতে হাসতে বলল— তুমি মহান, তুমি একুশে ফেব্রুয়ারি।

জয়নাল বলল, চাচাজির লেটেস্ট খবর কিছু জানো?

ইতি বলল, জানি। উনি ভালো আছেন। আরাম করে ঘুমোচ্ছেন। উনার বোন এসেছেন। তিনি ভাইয়ের হাত ধরে বসে আছেন। বসার ভঙ্গিটা একবার আড়াল থেকে দেখে আস। দেখলে ভালো লাগবে।

ভালো লাগবে কেন?

ইতি মুগ্ধ গলায় বলল, ভাইয়ের হাত ধরে উনি এমন কঠিন ভঙ্গিতে বসে আছেন যে দেখলেই মনে হবে— তার ভাইকে তার হাত থেকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কারো নেই। আজরাইলেরও নেই। আজরাইলকেও দরজার বাইরে থমকে দাঁড়াতে হবে।

জয়নাল আগ্রহের সঙ্গে বলল, চল তো দেখে আসি।

কিছুক্ষণ আগেই শামসুদ্দিন সাহেবের ঘুম ভেঙেছে। তিনি অবাক হয়ে রাহেলার দিকে তাকাচ্ছেন। একটু আগে ইতি যে চেয়ারটায় বসে ছিল এখন সেখানে অন্য একজন বসে আছে। যে বসে আছে সে দেখতে রাহেলার মতো, কিন্তু রাহেলা না। শামসুদ্দিন বললেন, কে?

মেয়েটা তার কাছে ঝুঁকে এসে বলল, ভাইজান আমি রাহেলা।

তোর রাগ কমেছে?

রাহেলা বলল, হ্যাঁ কমেছে।

রফিক কোথায়?

ও পৃথুকে নিয়ে বাইরে বারান্দায় বসে আছে। ডাকব?

না ডাকতে হবে না। তোরা খামাখা কষ্ট করিস না তো। বাসায় গিয়ে আরাম করে ঘুমো। আমি ভালো আছি। সকালে আমাকে রিলিজ করে দেবে।

রাহেলা বলল, ভাইজান, তুমি মোটেও ভালো নেই। এই যে আমি তোমার বিছানার পাশের চেয়ারে বসেছি— তুমি পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি চেয়ার থেকে উঠব না।

শামসুদ্দিন হেসে ফেললেন। রাহেলা বলল, ভাইজান, হেসো না। আমি কোনো হাসির কথা বলি নি।

শামসুদ্দিন বললেন, আচ্ছা যা, হাসব না।

রাহেলা চাপা গলায় বলল, তুমি আরাম করে ঘুমাও ভাইজান। তুমি আরাম করে ঘুমাও। আমি তোমার পাশ থেকে এক সেকেন্ডের জন্যেও নড়ব না।

শামসুদ্দিন ঘুমিয়ে পড়লেন।

হাসপাতালের বারান্দায় একটা বেঞ্চে পৃথু শুয়ে আছে। পৃথুর মাথা তার বাবার কোলে। যদিও বাবা হাত দিয়ে তাকে ধরে আছেন তারপরেও পৃথুর মনে হচ্ছে সে গড়িয়ে পড়ে যাবে। পৃথুর ঘুম আসছে না। তার প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। বাবা বলেছিল হোটেল থেকে খাবার আনবে, শেষ পর্যন্ত আনে নি। বাসায় একটার পর একটা সমস্যা। বাবা ভুলে গেছে। এখন তাঁকে খাবারের কথা বলতে তার লজ্জা লাগছে।

বাবা!

কী রে ব্যাটা ?

মা সবচে' বেশি কাকে পছন্দ করে বাবা ? তোমাকে, আমাকে, না বড় মামাকে ?

তোর বড় মামাকে।

তারপর ?

তারপর তোকে।

আমি সেকেন্ড, তাই না বাবা ?

হ্যাঁ।

আমার ফার্স্ট হতে ইচ্ছা করে বাবা।

ইচ্ছা করলেই ফার্স্ট হওয়া যায় না। ফার্স্ট হওয়া খুবই কঠিনরে ব্যাটা। আর কথা বলিস না, ঘুমো।

পৃথু ঘুমুতে চেষ্টা করছে। রফিক তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

পৃথু খুব মজার একটা স্বপ্ন দেখছে। বড়মামা হাঁচি কম্পিটিশনে নাম দিয়েছেন। তিনি সাদা রঙের জার্সি পরে বিশাল একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁচি দিচ্ছেন। একজন সবুজ রঙের পোশাক পরা মহিলা রেফারি, হাতে স্টপওয়াচ নিয়ে হাঁচির সংখ্যা গুনছে— ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ। মাঠের চারদিকে শত শত মানুষ। তারা খুব হৈ চৈ করছে। হাত তালি দিচ্ছে। বড়মামা হাঁচি দিয়েই যাচ্ছেন। ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে। হাঁচির কারণে বড়মামার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। তাঁর সাদা রঙের জার্সি লাল হয়ে যাচ্ছে। রেফারি বাঁশি বাজাচ্ছে আর বলছে, হবে না, হবে না, ডিসকোয়ালিফাই...। রেফারির কথায় খুব হৈ চৈ শুরু হলো। তাদের হৈ চৈ-এ পৃথুর ঘুম ভেঙে গেল। পৃথু দেখল সে হাসপাতালের বারান্দায় কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। তার মাথার পাশে সবুজ পোশাক পরা অপরিচিত একটা মেয়ে। আশেপাশে বাবা বা মা কেউ নেই।

সবুজ পোশাক পরা মেয়েটি বলল, তোমার নাম পৃথু ?

পৃথু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মেয়েটি বলল, তোমার বড়মামার শরীর হঠাৎ করে খুব খারাপ করেছে। তোমার বাবা মা দু'জনই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত। তুমি ভয় পেও না। আমি তোমার সঙ্গে আছি।

পৃথু বলল, আমি ভয় পাচ্ছি না।

সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটি বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ না জেনে আমার খুব ভালো লাগছে। সাহসী ছেলে আমার খুব পছন্দ।

পৃথু বলল, তোমার নাম কী ?

সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটি বলল, আমার নাম ইতি।

পৃথু বলল, ইতি, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

বলতে গিয়ে লজ্জায় তার গলা ভেঙে গেল। চোখে সামান্য পানিও এসে গেল। ইতি পৃথুর হাত ধরে বলল, আমার সঙ্গে চল তো দেখি ক্যান্টিন খুলেছে কি-না।

শামসুদ্দিনের নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। অল্প বয়স্ক ইন্টার্নি ডাক্তার অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছে। তার ডাক্তারি জীবন অল্পদিনের। এ ধরনের রোগী সে আগে দেখে নি। শামসুদ্দিনের শরীর থর থর করে কাঁপছে। জয়নাল দু' হাতে তাঁর কাঁধ ধরে আছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাহেলা দাঁড়িয়ে আছে। রাহেলাও শামসুদ্দিনের মতো কাঁপছে। রাহেলার হাত ধরে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। রফিক নিশ্চিত কিছুক্ষণের মধ্যেই রাহেলা মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তখন তাকে ধরতে হবে।

শামসুদ্দিনের জ্ঞান আছে। তিনি রফিকের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, রফিক, জয়নাল ছেলেটা আমেরিকা যাবার টিকিটের টাকা জোগাড় করতে পারছে না। আমার ড্রয়ারে তার টাকা আমি আলাদা করে রেখেছি। তুমি টাকাটা তাকে দিয়ে দিও।

রফিক কিছু বলার আগেই জয়নাল বলল, চাচাজি আমি টাকা জোগাড় করেছি। আমার টিকিটের টাকা নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

শামসুদ্দিন বললেন, আমেরিকা থেকে তুমি আমার বোনের জন্যে খুব ভালো সেন্ট কিনে পাঠাবে। সে দামি সেন্ট খুব পছন্দ করে।

মেডিকেল কলেজের প্রফেসর চলে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দু'জন ডাক্তার। শামসুদ্দিন সাহেবকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ওটির সামনে সবাই ভিড় করে আছে। শুধু জয়নাল সেখানে নেই। সে বেবিটেক্সি নিয়ে তার বাসায় চলে গেছে। বাসা থেকে সে পাসপোর্টটা নেবে। সেখান থেকে যাবে বাদামতলী। বাদামতলী থেকে একটা নৌকা ভাড়া করে সে যাবে বুড়িগঙ্গার মাঝখানে। মাঝ বুড়িগঙ্গায় সে আল্লাহকে বলবে— আল্লাহপাক, আমি আমার জীবনের সবচে' প্রিয় জিনিসের বিনিময়ে চাচাজির জীবন ভিক্ষা চাইছি। আমার সারা জীবনের শখ আমেরিকা যাওয়া। আমি আমেরিকা যাব না। আল্লাহপাক, আমি পাসপোর্টটা বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিচ্ছি।

সকাল দশটার সময় সত্যি সত্যি মাঝ বুড়িগঙ্গায় জয়নাল তার পাসপোর্ট ফেলে দিল। শামসুদ্দিন সাহেব মারা গেলেন সকাল এগারোটায়। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি চারদিকে তাকিয়ে জয়নালকে খুঁজলেন। বিড়বিড় করে বললেন, পাগলাটা গেল কোথায়?

পরিশিষ্ট

সতেরো বছর পরের কথা। এক মেঘলা দুপুরে জয়নাল নিউইয়র্কে জন.এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে নামল। তার সঙ্গে তার স্ত্রী, দুই পুত্র-কন্যা।

জীবন তার মঙ্গলময় হাত দিয়ে জয়নালকে স্পর্শ করেছে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সে অনেকদূর উঠে এসেছে।

জয়নালের বড় মেয়ে শর্মি খুবই অবাক হয়ে বলল, মা দেখ তো কাণ্ড! বাবা কাঁদছে। শর্মির মা ইতি বলল, বাবার দিকে এইভাবে তাকিয়ে থেকো না। সে কাঁদছে কাঁদুক।

এরকম করে কাঁদছে কেন মা ?

ইতি বলল, আমেরিকা আসা নিয়ে তোমার বাবার অনেক দুঃখময় স্মৃতি আছে। এই জন্যে কাঁদছে।

জয়নালের ছোট ছেলে টগর বলল, আমেরিকা বেড়ানো শেষ হলে আমরা ইউরোপ যাব। বাবা বলেছিল নিয়ে যাবে। সত্যি কি নিয়ে যাবে ?

ইতি বলল, তোমার বাবা যদি বলে থাকে নিয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই নিয়ে যাবে।

শর্মি বলল, বাবা কেমন হাউমাউ করে কাঁদছে। সবাই তাকাচ্ছে বাবার দিকে। আমার খুব লজ্জা লাগছে। মা, আমি কি বাবার কাছে যাব ?

ইতি বলল, না। তোমার বাবাকে একা কাঁদতে দাও। এসো আমরা দেখি আমাদের নিতে গাড়ি এসেছে কি-না।

নিউইয়র্কে জয়নালের একটি ব্রাঞ্চ অফিস আছে। বড় সাহেব প্রথমবারের মতো আমেরিকা আসবেন এই খবর তারা পেয়েছে। তারা লিমোজিন নিয়ে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে।

জন্ম ১৯৪৮, ১৩ নভেম্বর। ময়মনসিংহ জেলার কুতুবপুর গ্রামে। 'নন্দিত নরকে'-র মাধ্যমে '৭২ সালে হুমায়ূন আহমেদ যখন সাহিত্যাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করলেন— তখনই বোঝা গিয়েছিল কালস্রোতে এই নবীন লেখক হারিয়ে যাবেন না, এদেশের সাহিত্যাকাশে ধ্রুবতারার মতোই জ্বলজ্বল করবেন। তাঁর মধ্যে এই অমিত সম্ভাবনা তখনই টের পেয়েছিলেন প্রখ্যাত লেখক-সমালোচক আহমদ শরীফ এবং সে-কথা তিনি এক লেখার মাধ্যমে জানান দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন।... আহমদ শরীফ কাচকে হিরে ভেবে ভুল করেন নি— সেটা তো আজ সর্বজন বিদিত। শুধু তুমুল জনপ্রিয় লেখকই তিনি নন, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার হিসেবেও সফল। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। সত্যি কথা বলতে কী, হুমায়ূন আহমেদ যেন গল্পের সেই পরশ পাথর— যখন যেখানে হাত দিয়েছেন সোনা ফলেছে।... শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের কথকতা সহজ সরল গদ্যে তুলে ধরে পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব সীমিত নয়, বেশ কিছু সার্থক সায়েন্স ফিকশন-এর লেখক তিনি ; জনপ্রিয় চরিত্র মিসির আলী ও হিমুর স্রষ্টা তিনি— যে দুটি চরিত্র যথাক্রমে লজিক ও এন্টি লজিক নিয়ে কাজ করে।

হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত 'আগুনের পরশমণি', 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ও 'দুই দুয়ারী' চলচ্চিত্র তিনটি শুধু সুধীজনের প্রশংসাই পায় নি, মধ্যবিত্ত দর্শকদেরও হলমুখী করেছে বহুদিন পর। বিটিভি ও অসংখ্য প্যাকেজ নাটকের রচয়িতা ও নির্মাতা তিনি। নাট্যকার-নির্দেশক দুই ভূমিকায়ই সমান সফল।

কথাসাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন তিনি বহু পুরস্কার; উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে— একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, শিশু একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, অন্যদিন ইমপ্রেস টেলিফিল্ম পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ডস, বাচসাস পুরস্কার, টেনাশিনাস পদক ইত্যাদি।